ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ

গায়ে কাঁটা দেওয়া ১২টি কাহিনি

ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ

সৈকত মুখোপাধ্যায়

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ

পত্রভারতী
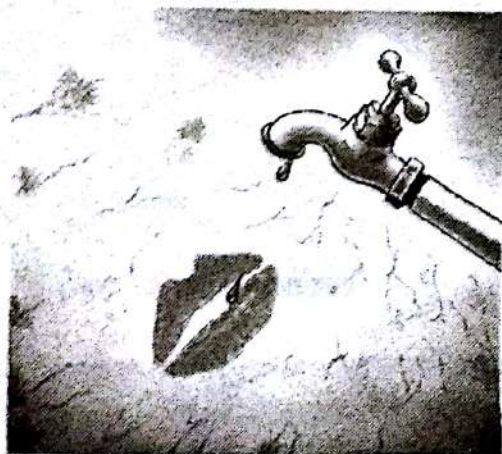
অন্ধকার স্রোতের সৈকতে

সাহিত্যের মূল ধারাটিকে যদি আলোকিত উজ্জ্বল স্রোত হিসেবে কল্পনা করা যায় তা হলে রহস্য, রোমাঞ্চ, গোয়েন্দা, ভৌতিক, হরার, ফ্যানটাসি, কল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি কাহিনি নিয়ে সাহিত্যের যে-ধারাটি বয়ে চলেছে তাকে বোধহয় অন্ধকার 'অশুভ' স্রোত বলা যেতে পারে। না, এটা আমার কথা নয়—সাহিত্য সমালোচক পণ্ডিতদের কথা। কারণ, আমি তো সেই ১৯৬৮ সাল থেকে, বাণিজ্যিক পত্রিকায় আমার প্রথম গল্প 'ভারকেন্দ্র' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই তথাকথিত 'অন্ধকার' স্রোতেই সাঁতার কেটে চলেছি। এবং চলেছি মনের আনন্দে। যদি এই অন্য ধারার সাহিত্যকে সাধারণভাবে 'জঁর ফিকশন' নাম দেওয়া যায় তা হলে বলতে পারি, আমার কিশোর অথবা সদ্য-তরুণ বয়েসে জঁর ফিকশনের লেখক এবং পাঠক, দুই-ই ছিল কম। সাহিত্যের আসরে জঁর ফিকশন ছিল মোটামুটিভাবে ব্রাত্য। আর সেই ফিকশন লিখিয়েরা বসার জায়গা পেতেন একেবারে পিছনের সারিতে।

অবস্থাটা এরকম ছিল বলেই বোধহয় ১৯৫৭ সালে 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যায় 'সাহিত্যে রোমাঞ্চ' নামে একটি রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন : 'জাত যদি যায় যাক্, তবু নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করছি যে রহস্য-কাহিনী আমি ভালোবাসি।'

১৯৫৯ সালে নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে (১৯৭০ সালে 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত) 'মাসিক রোমাঞ্চ'-র সম্পাদককে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন : 'কনান ডয়াল, চেস্টারটন প্রমুখ লেখক যে সাহিত্য রচনা করতে লজ্জিত নন, তা রচনা করতে আমারও লজ্জা নেই।'

বাংলা সাহিত্যের এই দুই দিকপালের এই দুটি মন্তব্যের পর একটি বিদেশি উদাহরণ দেওয়া যাক।

স্টিফেন কিং। জঁর ফিকশনের লেখক। ১৯৪৭-এ, ভারতের স্বাধীনতার বছরে, আমেরিকায় কিং-এর জন্ম। ১৯৬৭-তে লেখালিখি শুরু করে এখনও তাঁর কলম থামেনি। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৪টি উপন্যাস, ২০০ ছোটগল্প আর কয়েকটি প্রবন্ধের বই লিখেছেন। আর এই জঁর ফিকশনের যে-যে 'সাব-জঁর'-এ তিনি লেখালিখি করেছেন সেগুলো হল ঃ হরার, ফ্যানটাসি, সায়েন্স ফিকশন, সুপারন্যাচারাল ফিকশন, ড্রামা, গথিক জঁর ফিকশন, ডার্ক ফ্যানটাসি, পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপ্‌টিক ফিকশন, ক্রাইম ফিকশন, সাসপেন্স এবং থ্রিলার।

এই সাব-জঁরগুলোর বেশিরভাগের প্রচলিত বাংলা নাম অমিল বলে ইংরেজি নামের তালিকাটিই পেশ করেছি।

লেখক হিসেবে স্টিফেন কিং-এর অবস্থান বিশ্লেষণ করার জায়গা এটা নয়। তবে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কোনও সংস্কৃতিমান পাঠক স্টিফেন কিং-এর পাঠক হতে পারলে গর্ব বোধ করেন এবং নিজের বইয়ের আলমারিতে 'স্টিফেন কিং রচনাবলী'-কে সসম্মানে জায়গা দেন।

১৯৮০ সালে একজন সাংবাদিক স্টিফেন কিং-এর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রশ্ন করেছিলেন, 'Why do you write about fear and terrible manifestations?'

এই প্রশ্নের উত্তরে কিং বলেছিলেন, 'What makes you think I have a choice?'

শরদিন্দু, প্রেমেন্দ্র বলেছিলেন, জঁর ফিকশন লেখার ব্যাপারে তাঁদের লজ্জা নেই। স্টিফেন কিং গর্বের সঙ্গে এ-কথাই বলতে চেয়েছেন, এ ধরনের কাহিনি লেখা তাঁর ভবিতব্য।

১৯৫৭ থেকে ১৯৮০—তেইশ বছরে অবস্থাটা যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে জঁর ফিকশনের লেখক-পাঠকের অবস্থান। ১৯৮০-র পর কেটে গেছে আরও সাঁইতিরিশ বছর। এখন মনে হয়, লেখক যেমন মাথা উঁচিয়ে গর্বের সঙ্গে জঁর ফিকশন লিখতে পারেন, পাঠকও লেখকের সঙ্গে একই স্তরে দাঁড়িয়ে সেই ফিকশন পড়তে পারেন।

এরকমই একজন লেখক সৈকত মুখোপাধ্যায়, যিনি গত একযুগ ধরে নামি-অনামি পত্রপত্রিকায় দারুণভাবে লেখালিখি করে এই প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে প্রায় সামনের দিকটা দখল করে নিয়েছেন। সৈকত সাহিত্যের মূল ধারায় নিয়মিত কলমকারি করলেও অন্ধকার স্রোতে কম সাঁতার কাটেননি। তারই প্রমাণ এই বইয়ের বারোটি গল্প। গল্পগুলো জঁর ফিকশনের অন্যতম উপশাখা 'ডার্ক ফ্যানটাসি' চরিত্রের। বাংলা সাহিত্যের এই উপশাখাটির চর্চা হয়েছে কম।

'ডার্ক ফ্যানটাসি'-কে ফ্যানটাসি কাহিনির একটা সাব-জঁর বলা যেতে পারে। ফ্যানটাসি কাহিনির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মানুষের অন্ধকার নেগেটিভ দিক নিয়ে চর্চা করে 'ডার্ক ফ্যানটাসি'। তার সঙ্গে কখনও-কখনও মিশে থাকে ভয়, আতঙ্ক, মরবিডিটি, র' ট্র্যাজিক এলিমেন্ট কিংবা হরার এলিমেন্ট। এ ধরনের কাহিনির উদাহরণ হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের 'খগম' গল্পটির কথা মনে পড়ছে।

সৈকতের বারোটি গল্পের বিস্তার বারো রকম সুরে—একটির সঙ্গে অন্যটির কাহিনির কোনও মিল নেই। যেমন বিচিত্র তাদের প্লট, তেমনই অভিনব তাদের চমকের ভাঁজ। তবে গল্পগুলোর নানান সুর একজোট হয়ে যে-মন-কেড়ে-নেওয়া সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছে তার নাম 'ডার্ক ফ্যানটাসি'। আর গল্পগুলোর প্লট নিয়ে সৈকত অপরূপ দক্ষতায় ক্ষুরধার ভাষা দিয়ে বুনে দিয়েছেন এক-একটি কাহিনি। এককথায় এই বই পড়া একটি অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে নিশ্চয়ই আপনিও চাইবেন।

অনীশ দেব

ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ

এক

অনেকগুলো ঠেক-এ ঠোক্কর খাওয়ার পর শেষমেশ আমরা ভদ্রকালী শ্মশানে ঢুকে থিতু হয়েছিলাম। তার আগে নিরিবিলি নেশা করা যায় এমন একটা জায়গার খোঁজে বিস্তর ঘুরেছি। কিন্তু তখনকার দিনে উত্তরপাড়ার মতন মফস্বল শহরে, এমনকী রাতের বেলাতেও, প্রাইভেসির বড় অভাব ছিল। ধরুন স্টেশনের ওভারব্রিজ। সেখানে সিঁড়ির ধাপগুলো দখল করে বসে থাকত গুচ্ছের প্রেমিক-প্রেমিকা। সামান্য রুমাল কিম্বা সিগারেট-প্যাকেটের আড়ালে তারা এমন সব কাণ্ডমাণ্ড করত যে,

সেক্সুয়াল-জেলাসিতে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে যেত।

অন্যদিকে গঙ্গার ঘাটগুলোয় ছিল বুড়োবুড়িদের ভিড়। একদিন তাদের মধ্যে এক মক্কেল হঠাৎ আমার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, তুমি মধুদার নাতি না? ছি ছি ছি! অমন দেবতুল্য মানুষের বংশধর হয়ে মদ্যপান করছ? সেদিন থেকে গঙ্গার ঘাটকেও নমস্কার।

রেললাইন টপকে কয়েকদিন ইটখোলার মাঠে গিয়ে বসেছিলাম। ওখানে আবার এমন সব এলিমেন্টসদের আনাগোনা দেখলাম যে, সত্যি কথা বলতে কি ভয়ই পেয়ে গেলাম। ঠেক মারতে গিয়ে কি ছুরি খেয়ে মরব?

তখন আমাদের চারজনেরই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। সকলেই একটা যেমন-তেমন চাকরিও পেয়ে গেছি। দুঃখের মধ্যে, প্রেম করতে গিয়ে চারজনেই চার-রকমভাবে হাফসোল খেলাম। আড্ডায় সেইসব দুঃখের কথাই শেয়ার করতাম।

পেটে একটু মদ থাকলে দুঃখের কথাগুলো বেশ কবিতার মতন সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই শ্মশানঘাটে ঢোকার আগে জিটি রোডের ওপাড়ে বাবুল সাহার দোকান থেকে একটা সেভেন-ফিফটি ও.টি.র বোতল কিনে নিতাম। আমরা চারজন আর লেবুদা। পাঁচজনের ওতেই হালকা করে হয়ে যেত। হালকাই ভালো। মধ্যবিত্তের সন্তান, রাত হলে বাড়ি ফিরতে হত।

লেবুদাও বেশি খেত না। ওর ছিল শুকনো নেশা। বিড়ির মধ্যে গাঁজা পুরে খেত। আমাদের কম্পানি দেওয়ার জন্যে দু-এক ঢোক ভিজে। এমন সংযমের কারণ জিগ্যেস করলে, ওর সেই মার্কামারা স্নিগ্ধ হাসিটা হেসে বলত, বোকো না ভাই? ডিউটিতে আছি। মাতাল হয়ে গেলে চলবে?

ডিউটিতে থাকত সেটা ঠিক। লেবুদা মিউনিসিপ্যালিটির মাইনে পাওয়া ডোম, চব্বিশঘণ্টাই ওর ডিউটি। কিন্তু গাঁজা খেয়ে যে-ডিউটি করা যায়, সেটা মদ খেয়ে কেন করা যাবে না, তা ঠিক বুঝতাম না।

আমরা কিন্তু প্রতিদিন শ্মশানে আড্ডা মারতে যেতাম না। বড়জোর মাসে একবার। কখনো তাও হত না। আসলে চারজনের একসঙ্গে ছুটি পাওয়াটা বড় একটা হয়ে উঠত না। আমাদের মধ্যে পঙ্কার পোস্টিং ছিল দুর্গাপুরে, ও রেলে চাকরি করত। ভোকু ছিল আরও দূরে—কুচবিহারে। ওখানকার সরকারি হাসপাতালের প্যাথোলজিস্ট। আমি আর নয়ন অবশ্য কলকাতাতেই

চাকরি করতাম। কিন্তু পঙ্কা কিম্বা ভোকু না এলে আড্ডা মারার উৎসাহ পেতাম না।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা। বয়স বেড়েছে। বিয়ে-থা করেছি। হু-হু করে বছর গুলো কেটে যাচ্ছে। তবু কখনো কখনো একলা বারান্দায় বসে মনে পড়ে যায় ভদ্রকালী শ্মশানের সেই সন্ধেগুলোর কথা। আলো-আঁধারিতে ঢাকা বিশাল চত্বর। বড় বড় কয়েকটা নিম আর বেলগাছ। চত্বরের দক্ষিণদিকে শ্মশানকালীর মন্দির। মন্দিরের পেছনদিকে কাঠের চিতায় দাহ করার জায়গা আর ডানদিকে একটা নতুন বাড়িতে ইলেকট্রিক চুল্লি।

ওই দিকটাতেই শবযাত্রীদের আনাগোনা ছিল। আমরা বসতাম উত্তর প্রান্তে একটা পুরোনো ছাউনির নীচে। পেছনে ছিল চ্যালাকাঠের ডিপো আর লেবুদার থাকার ঘর। সেদিকটায় লেবুদা ছাড়া আর কারুর যাতায়াত ছিল না। আমাদের ঠিক পায়ের নীচ দিয়ে বয়ে যেত ভাগীরথী। নদীর ওপাশে জুটমিলের সার-সার আলো জলের ওপর এঁকেবেঁকে খেলা করত। স্রোতের অবিরাম ছলাৎছল শব্দে কেমন যেন ঘোর লেগে যেত। সেই ঘোর ভাঙত হঠাৎ ভেসে আসা হরিধ্বনিতে।

আমাদের তখনকার বিবাগী-মনের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যেত ওই পরিবেশ। সেইজন্যেই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। মড়াপোড়ার গন্ধটা নাকে সয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না।

লেবুদা ছিল একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। ঘাড় অবধি লুটিয়ে পড়া কাঁচাপাকা চুল। তীক্ষ্ণ নাক, টানাটানা চোখ। গায়ের রং বেশ ফরসা। 'ডোম' বলতে যে ছবিটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে তার সঙ্গে কোনো মিল ছিল না। নেশা চড়ে গেলে পঙ্কা ওকে হরিশ্চন্দ্র বলে ডাকত। বলত, তুমি বাবা কোথাকার শাপভ্রষ্ট রাজা, এখানে ডেকমাস্টারি করছ?

লেবুদা উত্তর না দিয়ে মুচকি মুচকি হাসত।

উত্তর দেওয়ার সময়ও পেত না অবশ্য। একটা অ্যাসিস্ট্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে চরকির মতন এদিক থেকে ওদিক ঘুরে দাহকার্য সেরে বেড়াত লেবুদা। ও-ই মৃতের আত্মীয়ের হাতে গঙ্গামাটির ডেলা ধরিয়ে মন্ত্র পড়াচ্ছে, ও-ই চিতা সাজাচ্ছে। আবার ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করতে হলে চুল্লির

লিভার টেনে ফার্নেসের ভেতরে ডেড-বডি ঢোকাচ্ছে সেই লেবুদা। মানে লেবুদাই ছিল ভদ্রকালী শ্মশানের অল-ইন-অল।

তার মধ্যেই একবার করে আমাদের চালার নীচে এসে একঢোক মেরে দিয়ে মুখে একমুঠো চানাচুর ঢুকিয়ে আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছে চিতার দিকে। আমরা দূর থেকে অবাক হয়ে দেখতাম, গনগনে আগুনকে ঘিরে ওর নর্তকের মতন ক্ষিপ্র নড়াচড়া। হাতে একটা লম্বা বাঁশ। তাই দিয়ে উলটে পালটে ভেঙে ফাটিয়ে এক্কেটা আস্ত মানুষের শরীরকে দু-ঘণ্টার মধ্যে এক্কালতি কয়লা বানিয়ে দিচ্ছে আমাদের ছদ্মবেশী হরিশ্চন্দ্র।

ভালো ছিল, লেবুদা মানুষটা খুবই ভালো ছিল। আমরা যে তিনবছর ওখানে গিয়েছি, কোনোদিন লেবুদাকে কোনো পার্টির সঙ্গে পয়সা নিয়ে জোরজুলুম করতে দেখিনি। সবসময়ে কথা বলত নীচুগলায়, শান্তস্বরে। কথার মধ্যে এমন সব শব্দ থাকত, যেসব শব্দ ঠিকঠাক ব্যবহার করতে গেলে বেশ ভালো বাংলা জানতে হয়। মনে হয় চণ্ডালের কাজটাকে শুধু কাজ নয়, ধর্ম হিসেবেই মানত লেবুদা। এমনিতে অত নীচু গলায় কথা বললেও, যখন মৃতের আত্মীয়ের হাতে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরিয়ে দিয়ে মৃতদেহকে প্রদক্ষিণ করাত, তখন আবেগে ওর গলা বেশ উঁচুতে উঠে যেত। শ্মশানের এক কোণে বসে শুনতে শুনতে ওর সেই দাহমন্ত্র আমাদেরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—

> কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বা অপি জানতা
> মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম
> ধর্মাধর্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতম
> দহেয়ং সর্বপাত্রাণি দিব্যান লোকান স গচ্ছতু।

এই লেবুদার মুখে ওই শ্মশানঘাটে বসেই একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনেছিলাম। লেবুদা বলেছিল ওই ঘটনা নাকি ওকে মানুষ হিসেবে বদলে দিয়ে গেছে। দুনিয়াটাকে ও আগে যে-চোখে দেখত এখন আর সেই চোখে দ্যাখে না।

সেদিন লেবুদা যা বলেছিল পুরোটাই এখনো মনে আছে। সচরাচর যে

এমন অভিজ্ঞতা হয় না, সে কথা ঠিক। তবে তারপর যে যেমন চোখে দ্যাখে। ভোকু যেমন সেদিন সব শোনার পরে বাড়ি ফেরার সময় খুব হেসেছিল। তেঁতো হাসি। বলেছিল, লেবুদা একটা গান্ডু।

আচ্ছা, ভোকুর কথা পরে বলছি। আগে লেবুদা কী বলেছিল সেটাই বলি।

দুই

রাত তখন সাড়ে আটটা-ন'টা হবে। আমরা যথারীতি ওই চালাঘরটার মধ্যে বসে আড্ডা মারছিলাম। সন্ধে থেকেই আবহাওয়া গুমোট ছিল, এইবার বৃষ্টি নামল। ভাদ্রমাসের বৃষ্টি, বেশিক্ষণ হয় না, কিন্তু যতক্ষণ হয় ততক্ষণ তার তোড় দ্যাখে কে।

বোধহয় সেই তাণ্ডব বৃষ্টির চোটেই শ্মশান সেদিন কিছুক্ষণের জন্যে শুনশান হয়ে গিয়েছিল। লেবুদার হাতে কাজ ছিল না। ও আমাদের পাশে এসে বসল। পক্কা হঠাৎ বলে বসল, লেবুদা, এতদিন শ্মশানে কাজ করছ, কখনো কিছু দ্যাখোনি?

লেবুদা ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করল, কিছু মানে?

মানে এই ইয়ে আর কি...ওই সবাই যা বলে...ভূতটুত?

তোমাদের মাথায় ভূতের কথাই আগে আসে কেন? ঈশ্বরের কথা আসে না?

ভোকুটা আমাদের মধ্যে একটু বেশি ফক্কর। বলল, বোঝোই তো, আমরা পাপী-তাপী মানুষ। ঈশ্বরের কীই-বা জানি? তুমি দেখেছ নাকি তাঁকে?

লেবুদা গম্ভীরগলায় বলল, দেখেছি। ওই ইলেকট্রিক চুল্লির মধ্যেই তাঁকে দেখেছি। মরা ঈশ্বর। ঝলসে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। তবু চিনতে ভুল হয়নি।

আমরা অন্ধকারের মধ্যেই যতটা খুঁটিয়ে পারি লেবুদার মুখচোখ স্টাডি করলাম। অন্যদিনের চেয়ে একটুও বেশি নেশাগ্রস্ত বলে তো মনে হল না। লেবুদা আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, কী ভাবছ? বাওয়াল

করছি?

না না। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম। আসলে তোমার কথাটা একটু ধাক্কা দেওয়ার মতন এটা তো মানবে?

ঠিক। ধাক্কা। এরকম একটা ধাক্কা দিয়েই তিনি আমাদের চোখ খুলে দেন। ওই দিনটার পর থেকে এই শ্মশানঘাটটাকে আমার মন্দিরের মতন মনে হয়। যারা এখানে আসেন, তাঁদের মনে হয় তীর্থযাত্রী। মনে হয় চোখের জলে তাদের পা ধুইয়ে দিই।

আমি বললাম, লেবুদা প্লিজ। কী হয়েছিল একটু খোলসা করে বলবে?

লেবুদা বলল, বছর দুয়েক আগের কথা বলছি। তোমরা তখনো এখানে যাতায়াত শুরু করোনি। এরকমই বর্ষার দিন ছিল। জন্মাষ্টমীর আশেপাশে একটা দিন। কালুয়া, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওর সেদিন জ্বর হয়েছিল। পুরো শ্মশানে সেদিন আমরা দুটি লোক। মন্দিরের চাতালে আমি একা চুপচাপ বসে আছি, আর ওই গেটের কাছে কাউন্টারে বসে আছেন ঘাটবাবু। এইসময়েই একটা মড়া এল।

খাটিয়ায় চড়ে নয়, এল পুলিশের কালো ভ্যানগাড়িতে। দুজন হাবিলদার গাড়ি থেকে প্লাস্টিকের চাদরে মোড়া বডিটাকে নামিয়ে চুল্লিঘরের সামনে শোয়াল। আর দুজন কাগজপত্র নিয়ে গেল ঘাটবাবুর অফিসে। আরো একজন মড়া ছুঁয়ে বসে রইলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সাধক মানুষ। বয়স বেশি না। কুচকুচে কালো দাড়ি। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরনে গেরুয়া ফতুয়া আর গেরুয়া ধুতি লুঙ্গির মতন করে পরা।

একটু বাদে ঘাটবাবুর ডাক শুনতে পেলাম। কাউন্টারে বসেই গলা তুলে আমাকে ডাকছিলেন। ভিজতে ভিজতে ওনার কাছে গেলাম। উনি বললেন, যে মেয়েটাকে পোড়াতে এনেছে সে গাড়ি চাপা পড়েছে। অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে নর্থবেঙ্গলে। মধুপুর না কি যেন নাম বলছে জায়গাটার। যাই হোক, পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট, পুলিশের সার্টিফিকেট সব জমা দিয়েছে। পাশ করে দিই, কী বল?

আমি ওনার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, নর্থবেঙ্গলে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? তাহলে উত্তরপাড়ায় নিয়ে এল কেন?

ঘাটবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আহা, বাড়ি যে এদিকেই। কোন্নগর

নবগ্রামে। পঞ্চায়েতের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটও জমা দিয়েছে।

বললাম, তাহলে আর কী? শুরু করে দিই। কাঠের আগুন না ইলেকট্রিক?

একজন হাবিলদার বলল, চুল্লিতেই দিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি হবে। আমাদের আবার আজকেই ফিরতে হবে।

ফিরে এলাম বডিটার কাছে। সাধুমতন লোকটাকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল। মুখচোখ থমথমে। প্রচণ্ড একটা কষ্ট যেন বুকের ভেতরে চেপে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল মৃত্যুশোকের থেকেও বেশি কোনো যন্ত্রণা। জিগ্যেস করলাম, কে হন আপনার?

উত্তর এল—স্ত্রী বললে স্ত্রী। সাধনসঙ্গিনী বললে সাধনসঙ্গিনী।

উনি মারা গেলেন কীভাবে?

কী বলব ভাই। কপাল। মধুপুরের রাস্তা ধরে দুজনে ফিরছিলাম। মধুপুর চেনেন তো? কুচবিহারের কাছে। শঙ্করদেবের সমাধি আছে ওখানে। আমাদের বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। ওখানেই গিয়েছিলাম দুজনে। হঠাৎ একটা গাড়ি ওকে পিষে দিয়ে চলে গেল। তারপর থানা পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া। ভাগ্যিস কুচবিহার থানার এই পুলিশভাইরা সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাই সামলাতে পেরেছি। ওনারাই ভ্যানগাড়িতে করে এই অবধি এনেছেন আমাদের। অনেক দয়া ওনাদের।

কথা বলতে বলতে হঠাৎই লোকটার গলা ভেঙে গেল। সে একহাতে বডিটা ছুঁয়ে অন্যহাতে চোখ মুছতে শুরু করল।

বললাম, চলুন। কেঁদে আর কী হবে? যে গেছে সে তো আর ফিরবে না। আমি আর উনি মিলে ধরাধরি করে বডিটাকে চুল্লির সামনে নিয়ে এলাম। বৃষ্টির জন্যে বডিটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা ছিল। দড়ির বাঁধন খুলে সেই ঢাকা সরিয়ে দিতেই বুকটা কেমন করে উঠল। বউমানুষ শুনে মনে মনে একটা ছবি এঁকেছিলাম। কিন্তু এ তো দেখছি নিতান্তই একটা বাচ্চা মেয়ে। বড়জোর ষোলো-সতেরো বছর বয়স হবে। মুখটা কালোর ওপরে সুন্দর। টানা টানা ভুরু, পাতলা ঠোঁট। এত যন্ত্রণা, এত রক্তপাত, কাটাছেঁড়া —সেসবের ছাপ মুখে পড়েনি। মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে আছে।

একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি আলতো করে শরীরের ওপর ঢাকা দেওয়া

ছিল। হঠাৎ একটা জোলো হাওয়ার দমকা এসে সেটাকে সরিয়ে দিতেই দেখলাম, পোস্টমর্টেমের ব্যাপারটা ঠিক। গলা থেকে তলপেট অবধি চট-সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতন ক্রশ-সেলাই। ও আমাদের চেনা সেলাই। হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ এলে ওই সেলাই নিয়েই আসে। সত্যি কথা বলতে কি, একটু নিশ্চিন্তই হলাম। পোস্টমর্টেমের পর ছাড়া পেয়েছে মানে কোনো গন্ডগোল নেই।

বেশি সময় নিলাম না। গোঁসাইবাবাকে চটপট মন্ত্র পড়িয়ে, মেয়েটার বডি চুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগবে। চলুন বাইরে গিয়ে বসি।

এই চালাটার নীচেই সেদিন দুজনে এসে বসেছিলাম।

লেবুদার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে নয়ন বলল, তুমি যে বলছিলে ঈশ্বরের মৃতদেহ। এ তো রক্তমাংসের নারীশরীরের কথা বলতে লেগেছ।

লেবুদা কখনো যা করে না, বোতল থেকে ঢক ঢক করে র-হুইস্কি গলায় ঢেলে বলল, চুপ করে শুনে যাও যা বলছি। লেবু ডোম মিথ্যে বলে না।

লেবুদা বলে চলল—এই চালাটার নীচেই সেদিন বসেছিলাম। এমনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। আমার পাশ থেকে মেয়েটার স্বামী হঠাৎ বলে উঠলেন, আমাদের ঘরে গোপাল আসছিলেন। তাঁর আর আসা হল না।

আপনার স্ত্রী বুঝি সন্তানসম্ভবা ছিলেন?

কান্নাহাসি মেশানো কেমন যেন একটা শব্দ বেরোল ওনার গলা থেকে। তিনি বললেন, সঙ্গম বিনে সন্তান হবে কেমন করে ভাই? আমরা এখনো সাধনার সেই স্তরে যাইনি যে মিলিত হব। আর ঈশ্বর কি কারুর সন্তান হন? তিনি হলেন সখা।

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, ও।

ওই কপালপোড়া মেয়ে, ওই আমার রাইবিনোদিনী—ও অষ্টপ্রহর স্বপ্ন দেখত ওর পেটে গোপাল আসছে। কত বোঝাতাম, ওরে অমন কথা বলিস না। আমরা কীটের কীট। তোর কি শচীমায়ের মতন পুণ্য আছে?

কিছুতেই বুঝত না, জানেন ভাই। খালি ওই এক কথা। আমি স্বপ্ন দেখেছি, গোপাল আমার পেটে আসছে। আমি যে তার নড়াচড়া টের পাই গো। বললে বিশ্বাস করবেন না, মধুপুরের মেলা থেকে জোর করে আমাকে দিয়ে বেতের দোলনা কেনাল।

দেখুন, আমাদের বয়সের তফাত তো অনেককখানি। বিনোদিনীর আঠেরো আর আমার পঁয়ত্রিশ। তাই কখনো কখনো ওকে নিজের মেয়ের মতনই লাগত। মেয়ের আবদার মেটানোর মতন করেই সেই দোলনা কিনেও দিলাম। আর ওই দোলনাটাকে বুকে জড়িয়েই আমার বউ গাড়ির তলায় চলে গেল।

আবার হু-হু করে কেঁদে উঠলেন সাধুবাবা।

তিন

একবার উঠে গিয়ে ফার্নেসের টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিয়ে এলাম। হাবিলদার চারজন দেখলাম মন্দিরের চাতালে বসে রুটি-মাংস খাচ্ছে। বললাম, একটু ওদিকে গিয়ে খান। তারপর আবার এসে বসলাম সাধুবাবার পাশে। বললাম, হয়ে এসেছে। আর পনেরো মিনিট।

উনি কিছু না বলে শূন্য চোখে নদীর দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করলেন, লেবুবাবু, আপনি সিদ্ধাই মানেন?

বললাম, সেটা কাকে বলে তাই তো জানি না। জানলে তবে না মানার কথা ওঠে।

উনি হতাশভাবে মাথা নাড়িয়ে বললেন, বিনোদিনীর কিছু কিছু সিদ্ধাই ছিল। ওর মনটা ছিল এমন একটা তারে বাঁধা, যে-ধাপে উঠতে আমাদের পাঁচবছর লাগে, সেই ধাপে ও পাঁচদিনের সাধনায় পৌঁছিয়ে যেত। বললে বিশ্বাস করবেন না, ওর সঙ্গে কণ্ঠিবদলের পর থেকে অনেকদিন আমি ভোররাতে ঘরের বাইরে বাঁশির সুর শুনতে পেয়েছি। হঠাৎ হঠাৎ কদমফুলের গন্ধে ঘুম ভেঙে যেত। অথচ ধরুন তখন শীতকাল। কদমের ক-ও নেই কোথাও।

বুঝলে নয়ন, আমরা ভাই বংশগত ডোম। আমার মা এই শ্মশানের চিতার কাঠে ভাত রেঁধে আমাদের খাইয়েছে। শরীর ছাই হয়ে গেলে যে আর কিছুই বাকি থাকে না সেটা আমার থেকে ভালো কে জানে? অন্তত তখন অবধি তাই জানতাম। তবু সেই সাধুবাবার কথা শুনে সেদিন আমার কেমন যেন গা ছমছম করছিল।

তারপরেই তিনি যা বললেন সেটা আরো মারাত্মক। বললেন, বিনোদিনীর অ্যাকসিডেন্টের তিনদিন আগে, মানে গত বুধবার রাতে পাশাপাশি বিছানায় শুয়েছি। বিনোদিনী হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের তলপেটের ওপর রাখল। বলল, দ্যাখো, আমার গোপাল আমার পেটের মধ্যে নড়াচড়া করছেন। এই দেখুন, বলতে বলতে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই আমার হাতের নীচে ওর পেটের ভেতরে একটা কিছু ঘাই দিয়ে উঠল।

পঙ্কা, তুমি ভোকুকে চোখ মারলে কেন আমি বুঝতে পারছি। আমার মনের ভেতরেও ওই সন্দেহটাই জেগেছিল। পাপ মন তো আমাদের। ভেবেছিলাম, নচ্ছার মেয়ে, স্বামীর সঙ্গ না পেয়ে অন্য কারুর বিছানায় শুয়ে পেট বাধিয়েছে। তারপর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গোপাল-টোপাল আলবাল বকছে। আমি সাধুবাবাকে বললাম, একটু বসুন। জল সেরে আসি। এই বলে সোজা ঘাটবাবুর ঘরে গিয়ে বললাম, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা একটু দেখি।

রিপোর্টের ফোটোকপিটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। অত তো ইংরিজি জানি না। মাধ্যমিক অবধি বিদ্যে। তবু ইনট্যাক্ট হাইমেন, ভার্জিন এইসব শব্দ পরিষ্কার পড়তে পারলাম। তখনই প্রথমবারের জন্যে মাথাটা কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু কি জানি?

ফিরবার পথে হঠাৎ মাংস পোড়ার গন্ধ ছাপিয়ে নাকে ঢুকল কদমফুলের মাতাল করে দেওয়া সুবাস। অথচ এদিকে একটাও কদমগাছ নেই।

লেবুদা একটা গাঁজার বিড়ি ধরিয়ে তিন টানে সেটাকে শেষ করল। তারপর বলল, কী যেন বলছিলাম?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ওই যে, কদমফুলের গন্ধ পেলে।

হ্যাঁ, শ্মশানে থাকি। মা ভদ্রকালীকে বুঝি। হাঁড়িকাঠ বুঝি, তন্ত্রমন্ত্র বুঝি।

কারণবারি বুঝি। কিন্তু কদমফুলের গন্ধ বুঝি না। বেতের দোলনা বুকে নিয়ে মরে যাওয়া বুঝি না। একটা আঠেরো বছরের মেয়ের পেটে গোপাল আসছে—এসব বড় অস্বস্তিকর বিষয়। আমি তাড়াতাড়ি দাহ সেরে লোকগুলোকে বিদায় করতে চাইছিলাম। ফিরে এসে গোঁসাইবাবাকে বললাম, চলুন, হয়ে গেছে।

উনি বাধ্য ছেলের মতন আমার পেছন পেছন ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুলিশগুলোও আসতে চাইছিল। আমিই বললাম, আপনারা এসে কী করবেন? জুতোটুতো খুলতে হবে। বাইরেই দাঁড়ান। ওরা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভেতরে ঢুকে ফার্নেসের সুইচ অফ করে মেয়েটার স্বামীকে বললাম, নীচে চলুন।

তোমরা তো জানো, আমাদের ফার্নেসের সিস্টেম। লিভার ঠেলে চেম্বারটাকে একটু পেছনের দিকে হেলিয়ে দিলেই চুল্লির ভেতরের মড়াপোড়া ছাই নীচের বেসমেন্টে একটা জায়গায় গিয়ে পড়ে। ওখান থেকেই আমরা পার্টিকে অস্থি আর নাভি দিয়ে দিই। সেগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি ফেরে।

সেদিনও আমি নীচে গিয়ে ছাই ঘেটে গোঁসাইয়ের হাতে ধরে-থাকা মাটির মালসার মধ্যে কয়েক টুকরো অস্থি তুলে দিলাম। তারপর বিনোদিনীর নাভি খুঁজতে শুরু করলাম।

হঠাৎ ছাইয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটা ভ্রূণ। কী হল, নয়ন, তোমার বমি পাচ্ছে নাকি?

নয়ন মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ওয়াক তোলা থামিয়ে বলল, না, না। তুমি বলো লেবুদা।

একটা ভ্রূণ। না, ভ্রূণ বলি কেন? প্রায় সম্পূর্ণ একটা শিশু। পুড়ে ঝলসে গেছে। হাত-পা-গুলো বেঁকে গেছে। চুল নেই চোখের পাতা নেই। তবু ঠোঁটের কোণে একটা সুন্দর হাসি লেগে রয়েছে।

আমি ভ্রূণটাকে দু-হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের পাতা পুড়ে গেল। এত গরম। এত ভারী। সোনার মতন উজ্জ্বল।

ছাইভর্তি মালসাটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে গোঁসাইবাবা বললেন, দিন লেবুভাই। ওনাকে এর মধ্যে শুইয়ে দিন। আমি নবগ্রামে আমাদের

কুঁড়েঘরের বারান্দায় সেই দোলনাটা খাটিয়ে এসেছি। এবার ঠাকুরকে ওর মধ্যে শুইয়ে দেব...বিনোদিনীর বেটাকে ওর মধ্যে শুইয়ে দেব। এই বলে তিনি অস্থির সঙ্গে ওই ভ্রূণটিকেও গঙ্গামাটির তাল দিয়ে ঢেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওদের সঙ্গে বেরোতে পারিনি। তারপর ওরা কে কোথায় গিয়েছিল তাও জানি না। আমি সেদিন সারারাত ওই বেসমেন্টের অন্ধকারে বসে ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণের দুঃখে কেঁদেছিলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে লেবুদা বলল, তবে আমি জানি তিনি আসবেন। তিনি আবার অন্য কোনো গর্ভে আসবেন। এটাই আমার বিশ্বাস।

ভোকু হঠাৎ জিগ্যেস করল, তারপর আর কখনো নবগ্রামে গিয়েছিলে, লেবুদা?

গিয়েছিলাম, তবে তাদের খুঁজে পাইনি। রমতা সাধু, বুঝলে? সাধুরা কখনো এক জায়গায় থাকে না। তাছাড়া পঞ্চায়তের সার্টিফিকেটে যে অ্যাড্রেসটা ছিল, সেটাও আমি ঠিক খুঁজে পাইনি।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমরা খালি বোতল ব্যাগে ভরে বাড়ির রাস্তা ধরলাম। এতক্ষণ বাদে হরিধ্বনি দিয়ে ভদ্রকালীর শ্মশানে একটা মড়া ঢুকছিল। লেবুদা ওদিকে এগিয়ে গেল।

ফেরবার পথে ভোকুটা এমন পাগলের মতন হাসতে শুরু করল, কী বলব? ফাঁকা রাস্তায় নেড়ি কুকুরগুলো অবধি ওর হাসি শুনে চিল্লাতে শুরু করল। আমরা বললাম, কী হল রে? খেপে গেলি নাকি?

দুঃখে হাসছি ভাই। ঘেন্নায় হাসছি। ঈশ্বরের ভ্রূণ। শালা, মাজাকি হচ্ছে? একটা বেওয়ারিস মেয়েছেলেকে খুন করে...।

খুন! আমরা আঁতকে উঠলাম। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তো অমন কিছু বলেনি।

ভোকু বলল—গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করলে বোঝা যায় নাকি? সেই গাড়িকে তো কেউ খুঁজেই পায়নি। আর বাংলাদেশের বর্ডারে ওরকম কত একলা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটাকে ধরে সাধনসঙ্গিনীর লাশ বানিয়ে ফেলা কি আর এমন কঠিন কাজ?

আমরা বললাম, এই ভেবে হাসছিস?

ভোকু বলল, তার আগের ব্যাপারগুলো শোন। লেবুদা যে-সময়ের কথা বলছিল, তখন আমি সবে কুচবিহার হাসপাতালে জয়েন করেছি। হঠাৎ পুরো জেলা জুড়ে হুলুস্থুলু। কী ব্যাপার? না, রাজমাতা মন্দির থেকে রাজার আমলের সোনার বালগোপালের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে।

জেলা প্রশাসনের তো পেছনে আছোলা বাঁশ। দাঙ্গা লেগে যায় আর কি। পুরো কুচবিহার জেলাটাই পুলিশ আর প্যারা মিলিটারি দিয়ে কর্ডন করে ফেলল। কোনো লাভ হল না। সে মূর্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পঙ্কা আমতা আমতা করে বলল, তুই কি বলতে চাইছিস ওই মূর্তিটাই বিনোদিনীর পেটে...?

তাছাড়া আবার কী? জটা দাড়িওলা ওই ডোমটাকে দু-বছর আগেও কুচবিহার হাসপাতালের মর্গে কাজ করতে দেখেছি। অটোপ্সি দেখেছিস কখনো? দেখতে যাস না, বমি করে ফেলবি। শুরুতে গলা থেকে তলপেট অবধি ফালি করে, সাঁড়াশি দিয়ে স্টারনাম উলটে লাশকে রেডি করে দেওয়ার কাজটা ডোমেরাই করে। ডাক্তারবাবু এসে কোনোরকমে ডোমের সঙ্গে কনসাল্ট করে রিপোর্ট লিখে বেরিয়ে যান। তারপর ওই যে ক্রস সেলাই, সেটাও দেয় ডোমেরাই। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাবার পরে নির্ঘাৎ ওই শালা ডোম বিনোদিনীর পেটের মধ্যে সোনার বালগোপালকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করে দিয়েছিল।

ও একা এই কাজটা করেছিল নাকি একটা গ্যাং পেছনে ছিল জানি না। আমি তো পুলিশ নই। তবে যারাই করে থাকুক, তারা জানত, কর্ডন এড়িয়ে মূর্তিটাকে কলকাতা অবধি নিয়ে আসার জন্যে এর চেয়ে সেফ রাস্তা আর হয় না। পুলিশের ভ্যানের মধ্যে শুয়ে থাকা ডেডবডির পেটের মধ্যে পুরে...ওহো। ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট! শুধু লেবুদাকে হিপনোটাইজ করে ফেলতে হবে। তাহলেই নাভির সঙ্গে সোনার গোপাল ফ্রি।

সেটা ওই লোকটা করেছিল। দারুণভাবে করেছিল। শুনতে শুনতে শালা আমিই আরেকটু হলে বিশ্বাস করে ফেলছিলাম। লেবুদাকে তো দেখলি, এখনো ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বাকি জীবনটা ওই আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যেই থাকবে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ভোকুকে জিগ্যেস করলাম, কী করবি ভোকু? পুলিশকে জানাবি?

ভোকু খালি বোতলটা ডাস্টবিনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কী হবে জানিয়ে? ও মূর্তি কবেই সোনার বিস্কুট হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে লেবুদার মতন একজন মানুষের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। ছেড়ে দে। খোঁজ নিয়ে দেখবি, ঈশ্বর সবজায়গাতেই এইরকম।

মাতালের কথা। কিছু মনে করলাম না।
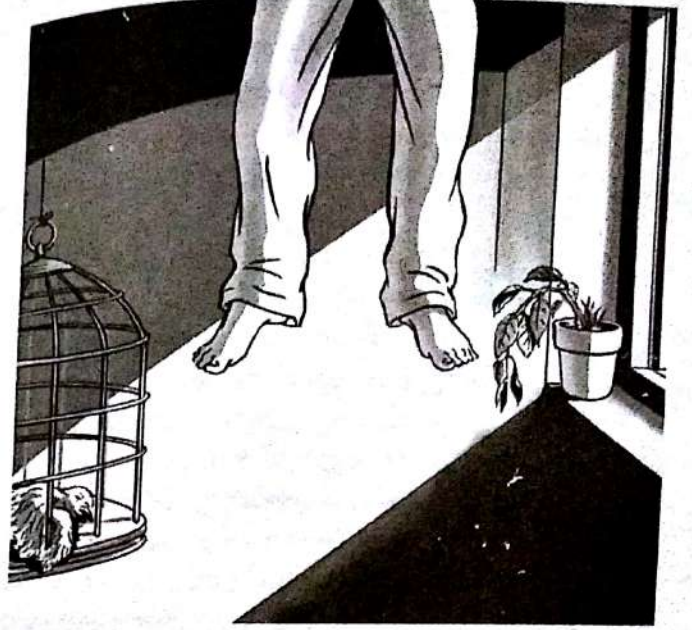
বাচ্চুমামার বাড়ি

ভদ্রেশ্বরে ওলাবিবিতলায় একটা নির্জন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এই পুরোনো একতলা বাড়িটা বিশাখার বাচ্চুমামার বাড়ি। সন্ধে সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়িটার বন্ধ সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিশাখা দুবার জোরে জোরে শ্বাস টানল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, বাড়িটা পচে যাচ্ছে। নাহলে দরজা-জানলার ফাঁকফোকর থেকে ছাতাধরা পাঁউরুটির মতন ঝাঁঝালো গন্ধ বেরিয়ে আসবে কেন?

শেষবার যখন সে এই বাড়িতে এসেছিল তখন তার ক্লাস টুয়েলভ। তখন তার বয়স ছিল আঠেরো, আজ পঁয়ত্রিশ। সতেরো বছর বাদে বিশাখা এই বাড়িতে পা রেখেছে, অন্য কিছু নয়, কোনো এক অলৌকিকের সন্ধানে। সে

যা চায় লৌকিক-চিকিৎসায় তার ব্যবস্থা নেই।

বিশাখা এখনো বেশি দূরে ট্র্যাভেল করতে পারে না। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু তার শরীর খুব দুর্বল। তাছাড়া ডাক্তার মিশ্র বলে দিয়েছেন হাসপাতালের কাছাকাছি থাকতে আর শরীরে বেশি ধুলোবালি না ঢোকাতে। তাই কামাখ্যা, কনখল কিম্বা কুম্ভমেলায় তার পক্ষে এখনই যাওয়া সম্ভব নয়; যদিও ওসব জায়গাতে আরো সহজে অলৌকিকের সন্ধান পাওয়া যায় বলেই বিশাখার বিশ্বাস।

সতেরো বছর আগে বিশাখা যখন প্রথম এই বাড়িতে এসেছিল, তখনই তার মনে এই বিশ্বাসের বীজ উড়ে এসে পড়েছিল যে, এখানেও আশ্চর্য কিছু ঘটে যাওয়া সম্ভব। বাচ্চুমামাই তেমন কিছু ঘটাতে পারে। সেইজন্যই বিশাখা একবার শেষ চেষ্টা হিসেবে আজ ভদ্রেশ্বরে এসেছিল।

বিশাখা বাচ্চুমামাকে জানায়নি যে, সে আসছে। জানাবে কেমন করে? বাচ্চুমামার ফোন-নম্বরই তো সে জানে না। সত্যিকথা বলতে কি, আজ এসে যদি শুনত বাচ্চুমামা মারা গেছে, কিম্বা দেখত এই বাড়িটার জায়গায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাহলেও বিশাখা অবাক হত না। সতেরো বছরে কত কী ঘটে যায়। তবু বিশাখা মাত্র দুবার কড়া নাড়তেই ঘড়াং করে সদরের খিলটা খুলে গেল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে বিশাখার বুকটা কেঁপে উঠল।

হ্যাঁ, বাচ্চুমামাই দরজা খুলেছে। সেইরকমই বেঁটে, মাকুন্দ, ঢুলুঢুলু চোখ—সতেরো বছর আগে যেমন দেখেছিল।

বাচ্চুমামার সঙ্গে বিশাখার মা কিম্বা মামা-মাসিদের চেহারার কোনো মিল নেই। তার অরিজিনাল মামাবাড়ির সকলেরই গড়নপেটন বেশ লম্বা-চওড়া। বিশাখাও মামাবাড়ির ধাত পেয়েছে। কিন্তু বাচ্চুমামা তো আর মায়ের নিজের ভাই নয়। কাজিন-টাজিনও নয়। নেহাত বরিশালের পাড়াতুতো সম্পর্ক।

বিশাখাকে দেখে বাচ্চুমামার কোনো বিকার ঘটল না। যেন বিশাখা রোজই পাঁচটা সতেরোর ব্যান্ডেল লোকাল ধরে কোন্নগর থেকে ওলাবিবিতলার এই বাড়িতে যাতায়াত করে। নির্বিকার গলায় ডাকল, কে বিনি? আয়! ভেতরে আয়!

বিশাখা খুব সাবধানে শ্যাওলা বাঁচিয়ে সরু উঠোনটা পার হল। বাচ্চুমামা যে ঘরটায় তাকে বসাল সেটার দেয়ালভরতি নোনা, বিমের ফাঁক দিয়ে টালির ছাদ ছাগলের পেটের মতন ঝুলে পড়েছে। জানলার দুটো শিক মরচে লেগে খসে পড়েছে। ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করা হয়েছে আড়াআড়িভাবে বাঁধা পাড়ের দড়ি দিয়ে। বিনি মানে বিশাখা চিনতে পারল, এই ঘরটাতেই সেবার মা আর সোনাদিদা দুপুরবেলায় শুয়েছিল।

সতেরো বছর আগে বাড়িটার অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। সেই প্রথম মা তাকে এই বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল। তার কয়েক মাস আগেই বিশাখার বাবা মারা গেছেন। বিধবা হওয়ার পর ওর মায়ের হাতে সময় বোধহয় একটু বাড়তি হয়ে যাচ্ছিল, তাই প্রায়ই এরকম ভুলে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে হানা দিতে শুরু করেছিল। বিশাখা অনেক সময় শুধু মাকে একা ছাড়তে ভয় পেত বলেই মায়ের সঙ্গে সেসব বাড়িতে যেত।

তাছাড়া আরো একটা গোপন কারণ ছিল। ও তখনই বুঝে গিয়েছিল পড়াশোনাটা তার দ্বারা আর বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। তার মাথা মোটা। কাজেই বিয়েটা চটপট হয়ে গেলেই ভালো। আর কে না জানে, অভাবনীয় সব বিয়ের সম্বন্ধ আত্মীয়দের বাড়িতেই লুকিয়ে থাকে? কাজেই বিশাখা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনোদিন এন্টালির মনুদিদার বাড়ি, কোনোদিন বেলঘরিয়ার জুলিকাকিমার বাড়ি, আবার কোনোদিন বা নৈহাটির সদামামার বাড়ি চলে যেত।

এইভাবেই একদিন মা বলল, চল, ভদ্রেশ্বরে সোনাপিসিমার কাছ থেকে ঘুরে আসি। বুড়ি কবে থাকে কবে চলে যায় ঠিক নেই। দেখা না হলে একটা আফশোস থেকে যাবে।

তো সেই যাওয়া।

বিশাখা শুনেছিল সোনাপিসিমার ছেলেটা জিনিয়াস, কিন্তু পাগল। খড়গপুর আই আই টি থেকে পড়া শেষ না করে পালিয়ে এসেছে। বাড়িতে এটা ওটা নিয়ে রিসার্চ করে। সেসব করে যে কি ঘোড়ারডিম হয় তা কারুর মাথায় ঢোকে না।

সেদিন দুপুরে খাওয়ার সময় একবার বাচ্চুমামাকে দেখেছিল বিশাখা। অমন নির্লোম নির্জীব বেটাছেলেকে দেখে তার কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠেছিল। ছেলেটা প্রায় কোনো কথা না বলেই খাওয়া সেরে উঠে গিয়েছিল। উঠোনের অন্যপ্রান্তে একটা ছোট ঘর ছিল, সেটাই নাকি তার ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা আর সোনাদিদা বাইরের ঘরের চৌকির ওপর গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। বিশাখার কোনোকালেই দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস ছিল না। সে অনেকক্ষণ ধরে একটা বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা নাড়াচাড়া করে বোর হয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে আসতে বেরোল।

হয়তো উচিত হয়নি, কিন্তু সেদিন সে বাচ্চুমামার ল্যাবরেটরি ঘরটাতেই প্রথম উঁকি মেরেছিল। বাচ্চুমামা তখন খালিগায়ে একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছিল। মুখ তুলে বিশাখাকে দেখতে পেয়ে, ইঙ্গিতে ভেতরে আসতে বলল।

বাচ্চুমামার লাচ্চা পরোটার লেচির মতন তেলতেলে আর থলথলে বডি। বিশাখা একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাচ্চুমামা বিনা বাক্যব্যয়ে তার প্রতিভা দেখাতে শুরু করেছিল। বাচ্চুমামা কথাটা কমই বলত।

একটা ঢাকা দেওয়া তাকের ভেতর থেকে একে একে তার তৈরি করা জিনিসগুলো সেদিন বার করে এনেছিল বাচ্চুমামা। প্রথমে দেখিয়েছিল একটা গোল ক্যাকটাস। এরকম ক্যাকটাস বিশাখা অনেক দেখেছে। যেটা দ্যাখেনি সেটা হল ক্যাকটাস-টার কেটে ফেলা মাথার ওপরে গজিয়ে ওঠা একটা সোনায় সাদায় মেশানো গোলাপ। অপূর্ব তার রং! যেন বরফের প্রান্তরে ভোরের আলো এসে পড়েছে। অপূর্ব তার গন্ধ। বিশাখা সেদিন সেই গোলাপের রূপে এমনই মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, খেয়ালই করেনি কখন বাচ্চুমামা টেবিলের ওদিক থেকে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পেছন থেকেই বাচ্চুমামা সেই দুপুরে বিশাখার সামনে বাড়িয়ে ধরেছিল পরের এগজিবিট—একটা লতা। লতা বললে তার কিছুই বোঝানো যায় না। আকার আকৃতি অনেকটা লাউডগার মতন, পাতাগুলোও সেইরকমই। কিন্তু পুরো লতাটাই যেন চুনিপাথর দিয়ে গড়া। এমন স্বচ্ছ, লাল আর উজ্জ্বল কোনো

উদ্ভিদ তার আগে অবধি দ্যাখেনি বিশাখা। পাতার ভেতরে শিরা-উপশিরায় রক্তরসের চলাচল সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ বিশাখার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। সে অবাক হয়ে দেখল বাচ্চুমামার ডান হাতটা তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঢুকে এসেছে ফ্রকের মধ্যে। তার ডানদিকের স্তনটা মুঠো করে ধরেছে বাচ্চুমামা আর স্কার্টের ওপর দিয়েই তার নিতম্বের ওপর চেপে বসেছে বাচ্চুমামার কঠিন পুরুষাঙ্গ। বিশাখা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই চড় তুলেছিল বাচ্চুমামার গালে সপাটে কষাবার জন্যে, কিন্তু বাচ্চুমামার অন্য হাতটার দিকে তাকিয়ে তার উঁচিয়ে ধরা হাতটা আপনা থেকেই নেতিয়ে পড়ল। সত্যি কথা বলতে কী আজ এতদিন পরেও সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে বিশাখার মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

বাচ্চুমামার অন্য হাতের মুঠোয় যত্ন করে ধরা ছিল একটা মুমূর্ষু খরগোশ। খরগোশটার টুকটুকে লাল চোখের ভেতর থেকেই চুনি-লতাটা গজিয়ে উঠেছিল। যেন ওটা খরগোশ নয়, একটা জ্যান্ত টব, যেখান থেকে রস শুষছিল সেই লতাটা।

একটা চিৎকার করে ল্যাবরেটরি থেকে সেদিন ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বিশাখা। সোনাদিদা তখনো ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু মা নিশ্চয় তার সেই চিৎকার শুনেছিল। তার মুখ-চোখ দেখে কী হয়েছে তা কিছুটা আন্দাজও করেছিল নিশ্চয়, যদিও পুরোটা আন্দাজ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। যাই হোক, তারপর মারা যাওয়ার আগে অবধি মা তাকে আর কখনো সোনাদিদার বাড়ি যাওয়ার কথা বলেনি।

তবুও আজ নিজে থেকেই বিশাখা দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে পা রাখল। পায়ের তলায় যখন আর মাটি পাচ্ছিল না তখন তার মনে পড়ে গিয়েছিল ওই ক্যাকটাস আর গোলাপের কিম্বা খরগোশ আর লাউডগার জোড়কলমের কথা। তাকে বাঁচতে হবে তো।

আজকের বাচ্চুমামার সঙ্গে সেই সতেরোবছর আগের বাচ্চুমামার অনেক অমিল দেখতে পাচ্ছিল বিশাখা। কী যেন এক ভয়ঙ্কর ফুর্তিতে আজ অস্থির হয়ে উঠেছিল লোকটা। ওর পোশাকটাও আজ হাস্যকর রকমের গর্জাস।

একটা লাল সবুজ চেক কাটা বারমুডা আর লাল টি-শার্ট। মাথায় আবার একটা নীল টেনিস-ক্যাপ ঘুরিয়ে পরেছে। হাতের মুঠোয় একটা চাইনিজ টর্চ মুঠো করে ধরে রেখেছিল। থেকে থেকে সেটাকে জ্বালাচ্ছিল আর নেভাচ্ছিল। চৌকির ওপরে বসিয়ে রাখা একটা অ্যান্টিক ট্রানজিস্টর সমানে ক্যানকেনে হিন্দি গান উগরে দিচ্ছিল আর তার সঙ্গে তাল রেখে বাচ্চুমামা কখনো তুড়ি দিচ্ছিল, কখনো শিস দিচ্ছিল, কখনো ঘাড় নাড়াচ্ছিল। একটা বিয়াল্লিশ বছরের লোকের কি এরকম আচরণ স্বাভাবিক? বিশাখা ভেবে পাচ্ছিল না।

সেই কি এই আনন্দের উৎস? তাকে দেখেই কি...?

কিন্তু না। জামাকাপড়গুলো তো সে আসার আগেই বাচ্চুমামা গায়ে গলিয়েছে। রেডিয়ো কিম্বা টর্চটাও নিশ্চয় সে আসবে বলে কিনে আনেনি।

এই নরকের মতন ঘরে, এই দমবন্ধ করা নির্জনতায়, এত আনন্দ মানায়? বিশাখা বাচ্চুমামার দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারছিল না বলেই মেঝের দিকে তাকাল। কিন্তু সেখানেও একটা আধমরা টিকটিকির ছানাকে অনেকগুলো ডেয়োপিপড়ে মিলে টানতে টানতে একটা ফাটলের দিকে নিয়ে চলেছিল। বিশাখা কোনদিকে তাকাবে বুঝতে না পেরে নিজের পায়ের পাতার দিকে চেয়ে বসে রইল।

একটু বাদে হঠাৎই রেডিয়োটা বন্ধ করে দিয়ে বাচ্চুমামা বলল, চল বিনি। ল্যাবরেটরি ঘরে চল। ওখানে বসেই তোর প্রবলেমটা শুনি।

একটা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে বাইরের ঘর থেকে ল্যাবরেটরির দিকে যেতে-যেতে বিশাখা অবাক হয়ে দেখছিল, বারান্দার একদিকে একটা লোহার তারে সার সার খাঁচা ঝুলছে। পাখির খাঁচা। নানা সাইজের, নানা শেপের খাঁচা। বাচ্চুমামা সেই টর্চটাকে জ্বালাতে-জ্বালাতে, নেভাতে-নেভাতে, একটু এগিয়ে গিয়েছিল। বিশাখা সাহস করে একটা খাঁচার কাছে মুখটা নিয়ে যেতেই বিশ্রী গন্ধে তার ওয়াক এসে গেল। সে দেখতে পেল খাঁচার ভেতরে একরাশ পালক ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পাখিটা মরে গেছে, তারই গন্ধ।

বিশাখা তাড়াতাড়ি বাচ্চুমামার নাগাল ধরবার জন্যে পা চালাল। হাঁটতে হাঁটতেই সে দেখল, সবক'টা খাঁচার ভেতরেই ঝরা পালক, মরা পাখি। শুধু তাই নয়। মাথার ওপরে যদি খাঁচা থাকে, তাহলে পায়ের কাছে রয়েছে ফুলের

টব। প্রত্যেকটা টবে একটা করে শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাওয়া ফুলগাছ।

বাচ্চুমামা। বিশাখা ডাকল।

বাচ্চুমামা হাঁটা থামিয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

বল।

এই পাখিগুলো...আর ওই গাছগুলো। মরল কেমন করে?

বলছি। চল। আগে তুই তোর কথা বল, তারপর আমি আমার কথা বলব। বাচ্চুমামা অবিকল কাচভাঙার শব্দের মতন আওয়াজ করে হাসল।

একটা হাতলভাঙা চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বাচ্চুমামা বলল, হ্যাঁ, এবারে বল। পৃথিবীতে এই একটা জায়গাই সেফ, বুঝলি বিনি? তুই নির্ভয়ে বলে যা। কেউ শুনতে আসবে না।

বিশাখা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, মানে? ফাঁকা বাড়িতে আবার কে কী শুনবে?

কি যে বলিস না! তুই আর বড় হলি না। আরে, শুয়োরের বাচ্চায় দুনিয়াটা ভর্তি। সবাই সারাক্ষণ টিকিটিকির মতন আমার ওপরে, শুধু আমার ওপরে নজর রেখে চলেছে।

বাচ্চুমামা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে একবার পুরো ঘরটায় পায়চারি করে এল। তারপর আবার দুহাতের মধ্যে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে চেয়ারে বসে পড়ল।

বিশাখা সালোয়ার কামিজ পরেছিল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎই মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে কামিজটা খুলে ফেলল। বাচ্চুমামার দিকে পেছন ফিরে বলল, ব্রায়ের স্ট্র্যাপগুলো খুলে দাও তো।

বাচ্চুমামার কী কামবোধ ফুরিয়ে গিয়েছে? নির্বিকার গলায় বলল, কেন?

দাও না। মুখে বলার চেয়ে দেখলেই তোমার বুঝতে সুবিধে হবে বেশি।

বাচ্চুমামা বলল, নীচু হ'। তারপর চেয়ারে বসেই ব্রা-এর হুকগুলো খুলে দিল। বিশাখা বাচ্চুমামার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বাচ্চুমামা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বিশাখার গলার কাছাকাছি মুখ এনে ঝুঁকে পড়ে তার বুকটা দেখতে শুরু করল। বিশাখার বুকে বাচ্চুমামার নিশ্বাস এসে লাগছিল।

সতেরো-বছর আগে এই লোকটাই তার ডান স্তনটা মুঠো করে ধরেছিল। সেই স্তনটা আর নেই। তার জায়গায় একটা বিশ্রী ক্ষত। সেটাই মন দিয়ে

আঙুল বুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল বাচ্চুমামা। বিশাখার বাঁ স্তনটা এখনও নিটোল এবং সুন্দর, কিন্তু সেটার ব্যাপারে বাচ্চুমামার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না।

বিশাখা মনে মনে বলল, মালটা ধ্বজে গেছে।

বাচ্চুমামা আবার তার সেই ভাঙা চেয়ারে বসে পড়েছিল। বসে বসে আঙুল মটকাচ্ছিল। বিশাখা উদোম গায়েই ওর মুখোমুখি একটা টুলের ওপর বসল। বলা যায় না, যদি আবার কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হয়।

বাচ্চুমামা একটু বাদে বলল, বাইরে থেকে বোঝা যায় না তো!

বিশাখা শুকনো হেসে বলল, ও কিছু না। ডানদিকের কাপে প্যাডিং আছে। কিনতে পাওয়া যায়।

তো, সেইভাবেই চালা না। না কি বিয়েটিয়ে করার ইচ্ছে আছে?

না বিয়ে নয়। আমার প্রফেশনটা মার খাচ্ছে। কাস্টমাররা এই বুক দেখলে ঘরের খিল খুলে প্যান্টের চেন আটকাতে আটকাতে দৌড়োয়।

এইবারে এমনকি নির্জীব বাচ্চুমামারও মুখটা একটু ফ্যাকাশে দেখালো। আমতা আমতা করে বলল, তুই কি...তুই কি...?

বিশাখা বাচ্চুমামার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। লাইনে নেমে গেছি। বছর দশেক হয়ে গেল। ভালোই চলছিল, কিন্তু তার মধ্যে এই ব্রেস্ট ক্যানসার। আমি শেষ হয়ে যাবো বাচ্চুমামা। না খেতে পেয়ে মরে যাব। তুমি আমাকে ওটা ফিরিয়ে দাও।

বাচ্চুমামা আমতা আমতা করে বলল, কী সব সিলিকন ট্রিটমেন্ট-ফিটমেন্ট আছে না? চেষ্টা করে দেখেছিস?

না। প্রথম কথা বড্ড খরচ; অত পয়সা নেই আমার। অপারেশন করাতেই ফতুর হয়ে গেছি। আর দ্বিতীয় কথা, বলতে খারাপ লাগছে, আমাদের প্রফেশনে বুকের ওপর যেরকম খামসা-খামসি চলে, অরিজিনাল মেয়েমানুষের বুক ছাড়া সে অত্যাচার সইতে পারবে না।

তারপরেই বিশাখা হঠাৎ খেপে উঠল। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, কেন? তুমি পারো তো। তাহলে ন্যাকামো করছ কেন? আমার জন্যে এইটুকু পারবে না?

কেমন করে বুঝলি, পারি?

বিশাখা উত্তর না দিয়ে ঘরের কোনায় রাখা খাঁচাটার দিকে তাকাল। বড়সড় খাঁচাটার মধ্যে একটা গিনিপিগ কপিপাতা চিবোচ্ছিল। তার পিঠের লোম ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা মানুষের কান, একেবারে রক্তমাংসের কান। শুধু সাইজটা স্বাভাবিক কানের চেয়ে অনেক বড়। প্রায় একটা ন-নম্বর হাওয়াই চটির মতন।

বাচ্চুমামা মুচকি হেসে বলল, তোকে মাথামোটা ভাবতাম। ভুলই ভাবতাম দেখছি। হ্যাঁ, পারি। এতদিন চেষ্টার পরে ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি। কিন্তু মুশকিলটা কী জানিস? ওই দ্যাখ, কানটা বেড়ে চলেছে। বেড়েই চলেছে। তবে কন্ট্রোল করার একটা রাস্তাও রিসেন্টলি বার করেছি অবশ্য।

তাহলে? তাহলে আর চিন্তা কিসের? বাচ্চুমামা, তুমি আমার ডানদিকেরটা ফিরিয়ে দাও। বিশাখা অবিকল বেশ্যার মতন রঙ্গ করে বলল—আমিও তোমাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেব, দেখো। আমিও ম্যাজিক জানি।

বাচ্চুমামা চিন্তিত মুখে বলল, না, ওসব কিছু নয়। আমি ভাবছি, কন্ট্রোলটা ধরে রাখার জন্যে আমাকে তো ঠিক থাকতে হবে।

তুমি তো ঠিকই আছ। বিঁশাখা অবাক হয়ে বলল।

সে তো এখন। কিন্তু যদি কিছু গন্ডগোল হয়ে যায়?

কিচ্ছু হবে না বাচ্চুমামা। ভগবান আছেন।

বড্ড লোভে ফেলে দিলিরে বিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আরেকবার বিশাখার বুকের এখানে ওখানে আঙুল দিয়ে টিপেটুপে দেখল বাচ্চুমামা। তারপর বলল, কখনো তো ভাবিনি গিনিপিগ বা খরগোশের বাইরে আর কোনো কিছুর ওপর পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাব। যাগগে, যা কপালে আছে তাই হবে। তুই তাহলে কাল চলে আয়। মাসখানেক থাকার মতন জোগাড়যন্তর করে আসবি। আশাকরি তার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রথমে বাচ্চুমামা তার বাম দিকের স্তনটা থেকে কিছু সেল নিয়ে পেট্রি-ডিশে কালচার করতে দিয়েছিল। তারপর সেই টিস্যু নিয়ে ডানদিকে ইমপ্ল্যান্ট করেছিল। এসব শব্দ বাচ্চুমামার কাছেই শেখা।

পনেরোদিনের মাথায় বিশাখা বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে লজ্জা পেল। তার আবার স্তনোদ্গম হচ্ছিল—যদিও শুধু একদিকে। সেই দশ-এগারো বছরের ফিলিংসটা আবার ফিরে আসছিল তার মধ্যে।

বাচ্চুমামার ফূর্তি দেখে কে? রংচঙে জামাকাপড় পরছে। ভাঙা সাইকেল নিয়ে সারা বিকেল রাস্তায় চক্কর মারছে। এমনকী একদিন খাঁচা ভর্তি মুনিয়া পাখি কিনে নিয়ে চলে এল। পরেরদিন টবে লাল রঙ্গন। গাছে জল দিচ্ছে, পাখিকে খেতে দিচ্ছে। কে বলবে এই লোকটাই সতেরো বছর আগে অমন নির্জীব ছিল?

একমাসের মাথায়, সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা, বিশাখা দেখল উঠোনের মাথায় একফালি আকাশের মধ্যে কোনোরকমে শরীরটাকে গলিয়ে দিয়েছে এত বড় একটা চাঁদ। আর সেই চাঁদের মরা-আলোর মধ্যে উঠোনের এক কোণে বসে আছে একটা ভূত।

না, ভূত নয়। বাচ্চুমামা। সাদা খাটো পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে বাচ্চুমামা কেমন যেন জড়ভরতের মতন বসে আছে। ওর গা থেকে সব রং উধাও। বিশাখাকে দেখে বাচ্চুমামা ডাকল—কে, বিনি? এদিকে শোন।

বিশাখা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাচ্চুমামার কাছে। লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, তোমাকেই খুঁজছিলাম। বাচ্চুমামা, দুটো একেবারে এক সাইজের হয়ে গেছে। এবার গ্রোথটা বন্ধ করে দাও।

বাচ্চুমামার কানে যেন কথাটা ঢুকলই না। বলল, বিনি, তুই ম্যানিক-ডিপ্রেশন কাকে বলে জানিস? কিম্বা বাইপোলার ডিজঅর্ডার? নাম শুনেছিস?

বিশাখা ঘাড় নাড়ল।

বাচ্চুমামা বলল, একটা অসুখেরই দুটো নাম। অসুখটা আমার আছে। কী হয় জানিস? এই ভীষণ ফূর্তিতে আছি। খাচ্ছিদাচ্ছি, নেচে বেড়াচ্ছি। নানারকমের এক্সপেরিমেন্ট করছি। এক মাস দু-মাস ভালোই কাটে। তারপরেই মাথার মধ্যে কী যে হয়ে যায়। অবসাদ, প্রচণ্ড অবসাদ আমাকে চেপে ধরে। কিচ্ছু ভালো লাগে না। কেবল মরে যেতে ইচ্ছে করে।

বিশাখা বলল, যাঃ! তাই আবার হয় নাকি?

প্রমাণ আছে। ওই পাখিগুলো। ওই গাছগুলো।

বিশাখা ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যোৎস্নার গাঢ় ছায়ায় ঢাকা খাঁচা আর টবগুলোকে দেখল।

যখন ভালো থাকি তখন পাখি কিনি, গাছ কিনি। খুব ভালো লাগে জানিস? মনে হয় কী সুন্দর এই পৃথিবীটা। প্রত্যেকটা পাতা, প্রতিটা পালকের পেছনে প্রকৃতির কত হাজার কোটি বছরের যত্নের ছাপ রয়েছে। ওদের ভালোবাসি, আদর করি। আমাদের শরীরও আলাদা কিছু নয়। তাই শরীরকেও আদর করতে ইচ্ছে করে।

বাচ্চুমামা, কীসব আবোলতাবোল বকছ?

সত্যিরে। যাই হোক, যা বলছিলাম। তারপর একদিন হঠাৎ সবকিছু অনর্থক মনে হয়। তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। প্রাণপণে চেষ্টা করি আত্মহত্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে। এদিকে বাড়ির উঠোনে আমার পাখি আর গাছগুলো খাবার না পেয়ে, জল না পেয়ে, মরে যায়।

বিনি, আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আমি যাই।

বাচ্চুমামা হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে দড়াম করে বাইরের ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

খিল লাগাল তো লাগাল। বাচ্চুমামার আর ঘর থেকে বেরোবার নাম নেই। বিশাখা প্রথমে কিছুদিন বাইরে বেরিয়ে দোকান থেকে পাখির জন্যে কাঙনদানা, গাছের জন্যে খোল আর নিজের আর বাচ্চুমামার জন্যে চালডাল কিনে আনছিল। গিনিপিগটাকে সে আলু কিম্বা কুমড়োর খোসা খেতে দিত।

তারপর পাড়ার গিন্নিরা অবাক হয়ে ওর বুকের দিকে চাইতে শুরু করল। ওদের মধ্যেই একজন একদিন বেশ উঁচু গলাতেই বলল, একটু ছোটবড় আমাদেরও অনেকসময় হয়। তাই বলে এত? আর কী সাইজ মা। ঘেন্না লাগে দেখলে।

তারপর বিশাখার আর বেরোবার মতন অবস্থা রইল না। সে জানলার ফাঁক দিয়ে বাচ্চুমামার জন্যে ভাতের থালা গলিয়ে দিত আর কেঁদে বলত, বাচ্চুমামা, স্টপ করো, স্টপ করো। আমি আর পারছি না। আমার পিঠে ভীষণ যন্ত্রণা বাচ্চুমামা। ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষুসির মতন আমার ডানদিকের বুক হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে। বাচ্চুমামা, দরজা খুলে বেরোও। কিছু একটা করো।

আঠাশ দিনের মাথায় মুনিয়াপাখিগুলো মরল। রঙ্গনগাছটা তো তার অনেক

আগেই মরেছিল। গিনিপিগটা ঠিক না খেতে পেয়ে মরেনি। ওর পিঠ থেকে গজিয়ে ওঠা সেই কানটা ওকে চুষে নিয়েছিল। শেষদিকে কানটা একটা কচুপাতার মতন বড় হয়ে গিয়েছিল। বিশাখা উঠোনে গর্ত করে ওটাকে পুঁতে ফেলেছিল।

পরের পূর্ণিমায় বিশাখা জানলার ফাঁক দিয়ে দেখল, মেঝে থেকে অনেকটা ওপরে বাচ্চুমামার পায়ের পাতা দুটো দুলছে।

এরপর বিশাখা নিজেও আর বেঁচে থাকার সাহস পায়নি।

ছাদের বাগান

আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, অসিতদাকে আমার সমস্যাটার কথা বলব। কখন বলব সেটাও ভাবা ছিল। যখন ডায়না বার থেকে মাল খেয়ে বেরিয়ে আমরা দুজন টানা রিকশায় চেপে শিয়ালদা ফিরব, তখন।

অসিতদা পণ্ডিত লোক। ন্যালাখ্যাপা পণ্ডিত নয়, বেশ গোছালো পণ্ডিত। কলেজের প্রফেসর। ইংরিজি কাগজে কলাম লেখে। ঘ্যাম-ই আলাদা। ধবধবে সাদা লিনেনের শার্ট আর গাঢ় নীল কর্ডের ট্রাউজারস ছাড়া কোনোদিন কিছু পরতে দেখিনি। চোখে সোনালি ডাঁটির রিমলেস চশমা। বরাবর দেখেছি, ডায়না থেকে মাল খেয়ে বেরোনোর সময় টেবিল থেকে

হাতে একটা পেপার-ন্যাপকিন তুলে নিতে ভোলে না। এসির ঠান্ডা থেকে বেরোলে চশমার কাচে ভেপার জমে যায় তো, সেটা ওই ন্যাপকিন দিয়ে মুছে তবে রাস্তা পেরোবে। চার পেগ ভোদকা মারবার পরেও যার মাথা এত ঠান্ডা থাকে, তার ওপর আস্থা রাখাই যায়।

এইজন্যেই ঠিক করেছিলাম, ওকেই আমার প্রবলেমের কথা বলব। তাছাড়া আমার আর জয়িতার অবৈধ প্রেমের গল্পটা ও একটা ধারাবাহিক উপন্যাসের মতন প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে পড়ে আসছে, মানে শুনে আসছে। ওই একটা দিনই আমরা দুজন ডায়নায় মিট করি এবং প্রথম গ্লাসটা শেষ হবার আগেই আমি জয়িতাকীর্তন শুরু করে দিই। অসিতদা কিছু মাইন্ড করে না। সাইকোলজির অধ্যাপক, সম্ভবত আমাকেও একটা কেস-স্টাডি হিসেবেই দেখে।

ডায়না বার থেকে বেরিয়ে, চাঁদনির মুখ থেকে টানা-রিকশায় উঠেছিলাম। সেই রিকশা গনেশ অ্যাভিনিউ ক্রশ করে অতীতকালে ঢুকে পড়ল। শুধু এই অতীত ভ্রমণটুকুর লোভেই ট্যাক্সির বদলে রিকশা চেপে আমরা শিয়ালদা ফিরি। আমাদের চোখে কলকাতার সমস্ত কড়া আলো ততক্ষণে অ্যালকোহলের প্রভাবে স্তিমিত হয়ে এসেছে, সমস্ত চিৎকারকেই মনে হচ্ছে গুঞ্জরণ। তিন হাত চওড়া গলিপথ ধরে টুঙ টুঙ ঘন্টি বাজিয়ে আমাদের টাইম-মেশিন এগিয়ে চলেছিল। গলির দুপাশে ভেজা ভেজা নীল দেয়ালের বাড়ি, বাড়ির দোতলায় ঝুলবারান্দা। ঝুলবারান্দার রট-আয়রনের রেলিং-এ জটিল লতাপাতার নকশা, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, আতাগাছে তোতাপাখি। বাড়িগুলোর একতলায় ঘুপচি ঘরের কোনোটায় দুর্গাপ্রদীপ জ্বেলে স্যাঁকরা ফুঁনলে ফুঁ মারছে, কোনোটায় দপ্তরী তুঁতের আঠায় বই বাঁধাচ্ছে। পুরো পথটায় ময়লা বাল্ব ঝোলানো কয়েকটা মুদিখানা আর পাথুরে কয়লার ডিপো ছাড়া অন্য কোনো দোকান নেই —না সিম কার্ড, না রোল পরোটা। কোথাও এমন কিছুটি নেই যা একশো বছর আগেও ছিল না। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, হজুরিমল্ল লেন টেন, আরো কীসব সরু সরু রাস্তা ধরে নেবুতলা পার্কে পৌঁছোনো অবধি আমাদের গতজন্মে ফিরে যাওয়ার এই ইলিউশন বজায় থাকবে। এই একটা সময়, যখন চেতন অবচেতনের পার্থক্য ঘুচে যায়,

কোনো কথাকেই গর্হিত মনে হয় না, কোনো কাজকেই অসম্ভব লাগে না। অসিতদাকে বলবার জন্যে এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছিলাম।

বললাম, অসিতদা, মালটাকে মার্ডার করতে হবে। তাছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না?

অসিতদা শান্তগলায় প্রশ্ন করল, কাকে, সোমনাথকে?

বললাম, তাছাড়া আর কাকে?

অসিতদা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও একটা মাত্র কাঠি খরচা করে আমাদের দুজনের সিগারেটই ধরিয়ে ফেলল। হাত কাঁপাকাঁপির কোনো গল্পই নেই।

এইজন্যেই অসিতদাকে এত ভালো লাগে। কোনোকিছুই ওর কাছে অকল্পনীয় নয়। অনৈতিক তো নয়ই। খাঁটি অ্যাকাডেমিশিয়ান যাকে বলে। ও শুধু-চায়, যা ঘটবে তা যেন পরিচ্ছন্নভাবে ঘটে। কেউ যদি কাউকে খুন করতে চায় করুক। তবে সাদা শার্টের হাতায় যেন রক্তের দাগ না লাগে। ওর কাছে 'কী করা হচ্ছে' তার থেকেও বড় কথা হল 'কীভাবে করা হচ্ছে'। তাই অসিতদার পরের প্রশ্নটার জন্যে আমি মনে মনে তৈরিই ছিলাম।

সোমনাথকে কীভাবে সরাবি তার কোনো উপায় ভেবেছিস?

আমি বললাম, সুপারি কিলার লাগালে কীরকম হয়?

অসিতদা ব্যাঁকা হেসে আমাকে একবার আড়চোখে মাপল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, মনে মনে বলল, ইডিয়ট। মুখে বলল, জয়িতা তোমার দিকে অনেকটা হেলে রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এটাও জেনে রাখো, খুনখারাপি হলে জয়িতা সে চাপ নিতে পারবে না। ভয়ের চোটে পুলিসের কাছে তোমার নাম ফাঁস করে দেবে।

আমি অসিতদার হাত চেপে ধরলাম। বললাম, কিন্তু অসিতদা, শুয়োরের বাচ্চাটা জয়িতার চোখের সামনে যতক্ষণ ঘুরে ফিরে বেড়াবে, ততক্ষণ জয়িতা কিছুতেই আমাকে পুরোপুরি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। এ কথা জয়ী নিজেই আমাকে বলেছে। সোমনাথ ভবঘুরে হতে পারে, বেকার হতে পারে, পাতাখোর হতে পারে কিন্তু তবু ও জয়িতাকে জীবনে প্রথম চুম্বনের স্বাদ দিয়েছিল। ও যতক্ষণ পৃথিবীতে থাকবে জয়িতা কিছুতেই পুরোপুরি

আমার হতে পারবে না।

অসিতদা বলল, 'পুরোপুরি আমার' কথাটা ঠিক বুঝলাম না অবশ্য। কোনো মানুষ আজ অবধি মনের দিক থেকে পুরোপুরি অন্য এক মানুষের হয়েছে বলে জানি না। সম্ভবত তুই শরীরের কথা ভাবছিস, ইন্টারকোর্সের কথা ভাবছিস।

মাথায় ভরপুর নেশা নিয়ে যতটা অপমানিত বোধ করা যায়, অসিতদার এই কথায় ততটাই অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, দিস ইজ আনফেয়ার অসিতদা। তুমি ভালোই জানো, আমি জয়িতাকে বিয়ের কথা ভাবছি। সেটা তো সোমনাথ না মরলে সম্ভব নয়।

অ।

অসিতদা, শিয়ালদায় তো ঢুকে গেলাম। একটা রাস্তা বাতলে দিয়ে যাও।

তুই এক কাজ কর নীলাদ্রি, তুই সোমনাথকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দে। ইনস্টিগেট হিম টু কমিট সুইসাইড। এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। মানে বুঝলি তো? এমন কিছু কর যাতে সোমনাথ সুইসাইড করে।

নৈহাটি লোকালের সময় হয়ে গিয়েছিল। অসিতদা রিকশার ভাড়া মিটিয়ে স্মার্টলি প্লাটফর্মের দিকে পা চালাল। আমি পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে ওর কনুই চেপে ধরলাম। বললাম, প্ররোচনাটা কী ধরনের হতে পারে সেটা তো বলো। ওকে চড়-থাপ্পড় মারতে গেলে জয়িতাই আমাকে বাধা দেবে।

অসিতদা এবারে সত্যিকারে বিরক্ত হয়ে বলল, রিয়েলি নীলাদ্রি, তুই এত ক্রুড ওয়েতে সবকিছু ভাবিস কেন বল তো? সুপারি কিলার! চড়-থাপ্পড়! বুলশিটস! কেন, ওকে একটা ছাদের বাগান করতে বলতে পারছিস না?

একটা অটো পেছন থেকে আমার দু-পায়ের ফাঁকে চাকাটা গলিয়ে দিয়ে তারস্বরে হর্ন বাজাচ্ছিল, তবু আমার সম্বিত ফিরতে ঝাড়া দেড় মিনিট সময় লাগল।

রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে দেখলাম অসিতদা ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

ছাদের বাগান! আত্মহত্যার প্ররোচনা! বিড়বিড় করতে করতে আমি কখন যেন বি আর সিং-এর পাঁচিলের গায়ে সারি সারি ফুলের নার্সারিগুলোর মধ্যে একটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। অবাক হয়ে শুনলাম, অন্য কেউ নয়, আমি নিজেই দোকানিকে জিগ্যেস করছি—একটা ছাদের বাগান করতে গেলে কী-কী লাগে ভাই?

এবার বোধহয় কে জয়িতা, কে সোমনাথ এসব একটু বলে নেওয়া দরকার। জয়িতা তেমন কেউ নয়, একটা এলেবেলে মেয়ে। সোমনাথ আরও এলেবেলে একটা ছেলে। বছর পাঁচেক আগে জয়িতা যখন সোমনাথকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, তখনও সে একটু-আধটু মানুষের মতন ছিল। কবিতা-টবিতা লিখত। উস্কোখুস্কো চুল, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা, মায়াবী চোখ। কথার মধ্যে দু-চারটে প্রেমের কবিতার লাইন গুঁজে দিতে পারত। তার ওপরে ভালো বাউলগান গাইত। যুগে যুগেই বোকা মেয়েরা এ ধরনের ছেলেদের প্রেমে পড়েছে এবং পরে পস্তিয়েছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। নতুনত্ব রয়েছে পাঁচবছরের মধ্যে জয়িতার দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ায়।

এবার জয়িতা তার ভাড়াটের প্রেমে পড়ল, মানে আমার।

বছর দেড়েক আগে আমি ওদের গুলাম আলি রোডের জরাজীর্ণ বাড়িটায় ভাড়াটে হয়ে ঢুকেছিলাম। তার আগে অবধি সোমনাথ কোনো এক পাবলিশারের ঘরে প্রুফরিডারের কাজ করত। গাঁজা চরসের ধোঁয়ায় বুদ্ধিবৃত্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ফলে এক নামজাদা ঔপন্যাসিকের পাণ্ডুলিপির এমন হাল করে ছেড়েছিল যে, সেই বাস্তববাদী উপন্যাস আগাপাস্তলা ভাববাদী হয়ে গিয়েছিল। এরপরে আর ওকে কাজ করতে দেওয়া পাবলিশারের পক্ষে নিরাপদ মনে হয়নি। অগত্যা দুবেলা দুমুঠো ভাতের পয়সা জোগাড় করতেই জয়িতা ওদের ছাদের ঘরটা আমাকে ভাড়া দিয়েছিল।

আমি সল্টলেকে একটা আই টি কোম্পানিতে চাকরি করি। অনেক সময়েই নাইট ডিউটি থাকে। তখন সারাদিন ছাদের ঘরে বসে এটা ওটা পড়ি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কলকাতার শেষ কয়েকটা আমগাছের মধ্যে একটার ডালে বিলুপ্তপ্রায় দুটো গাংশালিক বাসা বাঁধছে। আমি নেট সার্চ করি না, আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই, মোবাইলে বেশি কথা বলি না। আসলে আমার জীবন থেকে একটা মেয়ে কোনো চিহ্ন না রেখে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি জানতাম, এই সব তথ্যের স্রোত টোত খুব ফালতু ব্যাপার। জীবনে যারা সত্যিকারে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সঙ্গে হাজার মোবাইলেও কোনো কথা বলা যায় না। লক্ষ ফেসবুক প্রোফাইল ঘাটলেও তাদের মুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতাম আর মাসে একটা শনিবার আমার উত্তরবঙ্গের দেশের প্রতিবেশী অসিতদার সঙ্গে আড্ডা মারতাম।

বুঝতে পারতাম জয়িতা আমার দিকে নজর রাখছে। বুঝতে পারতাম আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে জয়িতা ব্যস্ততার ভান করছে। আসলে ওর কিছু করার নেই। ও-ও আমারই মতন একা, উপরন্তু কর্মহীন।

আলাপ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম জয়িতা ব্যাপক রোমান্টিক মনের মেয়ে। যে মেয়ে ব্যর্থ কবিকে ভালোবেসে নৌকা পুড়িয়ে দিতে পারে সে যে রোমান্টিক হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বুঝতে পারতাম ভালোবাসা জমে জমে ওর হৃদয় মৃতবৎসা গাভীর বাঁটের মতন টনটন করছে, ও ভালোবাসার দুধ ঝরাতে পারছে না।

কারণ হারামজাদা সোমনাথ বাড়িতে থাকে না।

চামড়ার বাছুরের ভূমিকায় নামতে আমার ঘোর আপত্তি ছিল। আমি প্রথম প্রথম জয়িতাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। বলেছিলাম—দ্যাখো এই সব পরিণতিহীন সম্পর্ক শুধু দুঃখই দেয়।

কিসের পরিণতিহীন? ফোঁস করে উঠেছিল জয়িতা। মেরে ফেলো না জানোয়ারটাকে। মেরে ফেল ওকে। আমি মুক্তি পাই তাহলে।

অতঃপর জয়িতা আমার মুখটা ওর সুগন্ধী দুই স্তনের মাঝখানে টেনে নিয়েছিল।

জয়িতার ক্ষুধার্ত শরীরের মধ্যে ডুবতে ডুবতেও আমি ভাবছিলাম—অপ্রেমের শূন্যতা শরীর কখনো পূরণ করতে পারে না। কোনোদিনও পারেনি। বোধহয় সেই শূন্যতাকে ভরাবার জন্যেই আমি জয়িতাকে জীবনপণ করে ভালোবেসে ফেললাম।

বুঝতে পারতাম জয়িতাও আমাকে ভালোবাসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা বছর পঁয়ত্রিশের নোংরা ছেলে। ভবঘুরে, বেকার, পাতাখোর। অনেকদিন বাদে-বাদে যে একবার করে উদয় হয়ে জয়িতাকে বলে, খেতে দাও। ভাত ছাড়া সে জয়িতার কাছে আজকাল আর কিছুই চায় না।

তবু তার জন্যেই জয়িতা এখনো হাতের চুড়িতে একটা সেফটিপিন লাগিয়ে রাখে। সেফটিপিন মানে লোহা, যে লোহার ছোঁয়ায় আমার প্রেতশরীর জয়িতার আলিঙ্গনের মধ্যেই হঠাৎ নির্জীব হয়ে পড়ে।

সেইজন্যেই এখন দিনরাত মনে পড়ে জয়িতার ওই কথাগুলো —মেরে ফেলো না জানোয়ারটাকে। আমি মুক্তি পাই।

আমাদের দুজনের মুক্তিই নির্ভর করছে সোমনাথের মৃত্যুর ওপরে। আর সোমনাথের মৃত্যু লুকিয়ে আছে ছাদের বাগানে।

সন্ধেবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিসের বাস ধরবার জন্যে বড় রাস্তার দিকে হাঁটছিলাম। দরজার ঠিক বাইরেই সোমনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখে প্রথমে একটু থতমত খেলেও শালা পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। একগাল হেসে বলল, এই যে নীলাদ্রি, একশোটা টাকা হবে? খুচরো নিয়ে এমন প্রবলেমে পড়েছি। পাঁচশো টাকার নোট কেউ ভাঙাতে চাইছে না। কালই তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব।

খুব খুশি হলাম। ফাঁদ সাজিয়ে রাখার পরে শিকারি যখন দেখে শিকার সেই ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে, তখন সে যেমন খুশি হয়, তেমনি খুশি। তিনদিন হয়ে গেল টব-ফব, মাটি-টাটি কিনে ছাদে ডাঁই করে রেখেছি, কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন তারই দেখা নেই। আমি সোমনাথের হাতটা

চেপে ধরে বললাম, কেন দেব না ভাই, নিশ্চয়ই দেব। তবে এখন নয়।

এখন নয়? কেন?—সোমনাথের মুখচোখ হিংস্র হয়ে উঠল।

ঘাবড়ালাম না। ঘাবড়ালে চলবে না। গম্ভীরভাবে বললাম, একশোর অনেক বেশিই দেব। তবে তার জন্যে আমার ছাদের বাগানের দেখাশোনার ভারটা তোমাকে নিতে হবে।

টাকার কথায় সোমনাথ বেশ উৎসাহ পেল। সুর করে বলল, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর। চলো, কোথায় কী করতে হবে দেখিয়ে দাও।

সেদিন আর অফিস যাওয়া হল না। সোমনাথকে নিয়ে ছাদে উঠলাম। ব্যাটাচ্ছেলে মাটি নিয়ে খানিক ঘাঁটাঘাঁটি করে উঠে পড়ল। বলল, দাও, এবার টাকা দাও।

দিলাম টাকা। বাগান করাটা তো আমার উদ্দেশ্য নয়। ওকে ক্রমশ এই ছাদের বাগানের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলাটাই একমাত্র কাজ।

তাই পরের দিন যখন দেখলাম, ও নিজে থেকেই সন্ধেবেলায় ছাদে উঠে বসে আছে তখন উত্তেজনায় আমার নিশ্বাস দ্রুত পড়তে শুরু করল। অসিতদার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়লাম। এমনি এমনি সাইকোলজির প্রফেসর হয়? সেদিন সোমনাথ বারোখানা টবে সারমাটি ভরে ফেলল। যাবার আগে আমার কাছ থেকে টাকা নেবার সময় বলে গেল, টব তৈরি। কাল গাছ এনে দিও।

পরেরদিন ছিল মাসের প্রথম শনিবার। অসিতদাকে অগ্রগতির কথা জানিয়ে বললাম, শিয়ালদা থেকে গাছ কিনে নিয়ে যাব। কী গাছ কিনি বলো তো।

অসিতদা একটু ভেবে বলল, গাছ কিনিস না। গাছের বাল্‌ব...বাল্‌ব বুঝিস তো? কন্দ। কন্দ কেন। তাহলে অনেকটা সময় পাবি। ভুঁইচাঁপার বাল্ব কিনে নিয়ে যা। মাসখানেক জল ঢালার পর মাটি ফুঁড়ে একটু অঙ্কুর মাথা তুলবে। তারও অনেকদিন পরে পাতা ছাড়বে। তারপর ফুল। ফুল হতে হতে সোমনাথ সুইসাইড করবে। তবে তা যদি না হয়...।

কী না হয় সোমনাথদা? উদ্বিগ্নমুখে জিগ্যেস করলাম।

মানে কোনো কারণে যদি সোমনাথ মরার আগেই ফুল ফুটে যায়...।

কী হবে তাহলে?

নাঃ, তার চান্স নেই। যার চান্স নেই তা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই ভুঁইচাঁপাই কিনে নিয়ে যা।

নিয়ে এলাম ভুঁইচাঁপার কন্দ। টবে টবে সেই কন্দ পুঁতে আলতো হাতে জল দিল সোমনাথ। পরেরদিন দুপুরে আমার আর জয়িতার সঙ্গমের মধ্যে কার যেন শরীরের ছায়া পড়ল। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জানলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমনাথ। তার মুখ ঝুলনের পুতুলের মতন ভাবলেশহীন। এরকমই কী হবার কথা ছিল? শেষ কবে যে সোমনাথ দিনের বেলায় বাড়ি ফিরেছে তা জয়িতাও মনে করতে পারে না। তবু সোমনাথ আজ এসেছে। সে কি বাগানের টানে, না কি মৃত্যুর?

কী জানি। এ সব প্রশ্নের উত্তর শুধু অসিতদাই জানে।

দরজা খুলে যতক্ষণে বাইরে বেরোলাম ততক্ষণে সোমনাথ টবের সারির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দিকে না তাকিয়েই সোমনাথ বলল, বেশ খানিকটা বিষ এনে দিও তো।

বুকের রক্ত চলকে উঠল। শুকনো গলায় জিগ্যেস করলাম, কেন?

টবের মাটিতে পোকা ঘুরছে।

মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। অসিতদা হত্যাকেও কি নিপুণ শিল্পরূপ দিতে চলেছে! ঘুঘু প্রফেসর সব জানত—ছাদের বাগানের টানে সোমনাথ দিনের বেলায় বাড়ি ফিরবে, আমাকে আর জয়িতাকে শঙ্খলাগা অবস্থায় আবিষ্কার করবে, তারপর...তারপর সোমনাথের চারিদিকে ছড়ানো থাকবে বিষ...।

আমি দেরি না করে সেইদিন বিকেলেই বাজারের সেরা যত কীটনাশকের কৌটো কিনে এনে ছাদের চারিদিকে সাজিয়ে রাখলাম। আঃ! এরপর সোমনাথ নেশাতুর চোখে যেদিকেই তাকাবে, দেখবে আড়াআড়ি হাড় আর মড়ার খুলি তাকে আয় আয় বলে ডাকছে। ও কি সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে?

মাসখানেকের মধ্যে কিছু হল না অবশ্য। মনে মনে ভাবলাম, এ তো সুপারি দিয়ে খুন নয় যে চুলের মুঠিটা ধরল আর চপার দিয়ে গলাটা ফাঁক করে দিল। এ রীতিমতন সাইকো-মার্ডার। এফেক্ট পাওয়ার জন্যে

দু-দশ দিন সময় লাগতেই পারে। সুবিধেটা হল, কোনো আফটার এফেক্ট থাকবে না।

যুক্তি যাই বলুক, মনে মনে অধৈর্য্য লাগছিল খুব। সোমনাথকে আরো একটু প্ররোচিত করার জন্যে একদিন বেছে বেছে ওর আসার সময়টাতেই আমার ছাদের ঘরের জানলা হাট করে খুলে রেখে জয়িতাকে একরকম রেপই করলাম। সেদিন ছায়াটা আর জানলার পাশে থমকাল না; যে গতিতে আসছিল, সেই গতিতেই জানলা পেরিয়ে ছাদের অন্য প্রান্তে চলে গেল। ধর্ষণ সেরে টলতে টলতে বাইরে এলাম। রাস্তা থেকে একগাদা নেড়িকুকুরের তারস্বর ফোয়ারার মতন ছাদের দিকে উঠে আসছিল। দেখলাম সোমনাথ আলসে থেকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। আমাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কী কষ্ট যে হয় নীলাদ্রি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। দেখো, নীচের দিকে তাকাও। শুধুই ভাদুরে কুত্তা, শুধুই ভাদুরে কুত্তা চতুর্দিকে। আর ভিখিরি, মাতাল, চর্মরোগি, বেশ্যা, ঠক, দালাল...।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। সোমনাথ বলল, আজকালের মধ্যে খুব ধারালো একটা ছুরি এনে দিতে পারবে?

আমার গলাটা উত্তেজনায় কেঁপে গেল। বললাম, কী করবে?

বাঁখারি চাঁছব। চারাগুলো হেলে পড়ছে। বাঁখারি চেঁছে ঠেকনা দিতে হবে।

শুধু ছুরি নয়, আমি সারা বাজার ঢুঁড়ে যেখানে যত ধারালো অস্ত্র পেলাম সব এনে ছাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রাখলাম। পারবে কি সোমনাথ এই প্রলোভন এড়িয়ে যেতে?

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু হল না অবশ্য। শুধু একদিন দেখলাম সোমনাথের কব্জির কাছে একটা ন্যাকড়া জড়ানো রয়েছে। বললাম, কী হয়েছিল? ও বলল, কিছু না। অসাবধানে একটু কেটে গিয়েছিল আর কী।

মনে মনে হাসলাম। সময় হয়ে এসেছে। সোমনাথ আমি দেখেছি, তুমি আজকাল বড্ড বেশি সময় নিয়ে বিষের কৌটো নাড়াচাড়া করো। তুমি নিজের কব্জির ওপর ছুরির ফলাটা ঘষো। তুমি নীচু আলসের ওপর দিয়ে

বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ো। সোমনাথ তুমি জানো না, সমস্ত সৌন্দর্যের আড়ালে এই ছাদের বাগান আসলে কি ভীষণ এক মৃত্যুফাঁদ। পতঙ্গভুক ফুলের মতন এই বাগান তোমার চারদিকে এর মোহন পাপড়িগুলোকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছে, আর তুমি কীটস্য কীট, নির্জীবের মতন ঘোরাঘুরি করছ এই ছাদের বাগানে।

ভাদ্র পেরিয়ে আশ্বিন চলে এল। আকাশ এখন কচুরিপানা ফুলের পাপড়ির মতন নীল। সোনালি রোদ সারাদিন ছাদের বাগানে শুয়ে বসে আলসেমি করে, আর সেই রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সোমনাথ। কখনো জবা গাছের পাতা থেকে শুঁয়োপোকা ছাড়ায়, কখনো সূর্যমুখীর টবে সার দেয়। অবাক হয়ে ভাবি, এসব ফুলের গাছ ওকে কে কিনে এনে দিল! আমি তো দিইনি। ও নিজে এনেছে! ও কি এই ছাদের বাগানকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে?

রোববার আমাকে অফিস যেতে হয় না। এই একটা রাত ঘরেই থাকি। সেরকমই এক রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়তে পড়তে দেখলাম, ছাদের মাঝখানে যে ছোট ইটের বেদিটা রয়েছে তার ওপরে চুপ করে বসে আছে সোমনাথ। কী আশ্চর্য! ও কি নেশাভাঙ ছেড়ে দিল? দিনেও বাগান করছে, রাত্তিরেও এখানে বসে আছে! আমি বই মুড়ে রেখে ঘর থেকে বেরোলাম। আস্তে আস্তে সোমনাথের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, কী করছ সোমনাথ?

সোমনাথ নিমগ্নস্বরে বলল, ছাদ এক আশ্চর্য জিনিস, তাই না নীলাদ্রি? স্বর্গ আর নরকের মধ্যে হাইফেন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি নীচে তাকালে নরক, ওপরে চাইলে স্বর্গ। দ্যাখো, আকাশটা দ্যাখো।

দেখলাম, কুচকুচে কালো বাতাস কেটে ক'টা সাদা ধবধবে নিশিবক ধীর ছন্দে ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে চলেছে। অনেক দূরের কোনো মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসেও যেন ধূপধুনোর গন্ধ। না কি ছাদের বাগানে হাসনুহানা ফুটল?

ঘরে ঢুকে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শোয়াই সার, ফুলের গন্ধে ঘুম আসছিল না। অদৃশ্য ঘড়ির কাঁটা টিক টিক শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছিল। কেবলই মনে পড়ছিল, সেদিন অসিতদা কি যেন একটা বলতে গিয়েও বলেনি। সোমনাথ মারা যাওয়ার আগে যদি ভুঁইচাঁপার ফুল ফুটে যায় তাহলে কি যেন একটা হবে?

এক বুক তেষ্টা নিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছাদের দিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মধ্যরাতের ছাদের বাগান। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আত্মহত্যার অজস্র প্ররোচনা—নানান মাপের বিষের শিশি, নীচু পাঁচিল, অজস্র ধারালো যন্ত্র, প্লাস্টিকের ব্যাগ, দড়ি। সেই সবের মাঝখানে আমার দিকে পেছন ফিরে ইটের বেদির ওপর তখনো একইভাবে বসে আছে সোমনাথ। শুধু এখন ও আর একা নয়। ওর কাঁধের ওপর মাথা রেখে বসে আছে জয়িতা। জয়ীর একটা হাত এমনভাবে সোমনাথের রোগা শরীরটাকে জড়িয়ে রেখেছে, মৃত্যুর পক্ষেও সেই বাঁধন খুলে সোমনাথকে নিয়ে যাওয়া কঠিন। দেখলাম, ওদের ঠিক সামনে সার সার বারোটা টবে বারোটি রাজকন্যা—তেমনই তন্বী, তেমনই শুভ্র, তেমনই স্বপ্নগন্ধা। ভুঁইচাঁপা ফুটেছে। ওরা দুজনে সেই ফুলের দিকেই তাকিয়ে বসে রয়েছে।

যে তেষ্টা নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম, সেই আমর্ম তেষ্টা নিয়েই বিছানায় ফিরে এলাম। শুলাম না, বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসলাম। সোমনাথের জন্যে গতকালই বড় এক শিশি তরল কীটনাশক কিনে এনেছিলাম, ওকে দেওয়ার সময় পাইনি। শিশিটা আমার বেডসাইড টেবিলেই রাখা ছিল। আমি পুরো তরলটা আমার গ্লাসে ঢেলে নিলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার এ তেষ্টা জলে মিটবার নয়।

গুহাচিত্র

বহুদিন বাদে সেদিন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার সামন্তর চেম্বারে বসে বিজুরিকে সামনাসামনি দেখেছিলাম। সেটা এপ্রিল হতে পারে, কিম্বা ডিসেম্বর। গ্রীষ্ম কিম্বা শীত। চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশনড ছিল বলে আমার শীত গ্রীষ্মের কোনো স্মৃতিই নেই। তবে বর্ষাকাল ছিল না এটুকু বলতে পারি। কারণ ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পেছনের কাচের জানলার ও পারে কলকাতার স্কাইলাইন বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। বৃষ্টি ছিল না।

বিজুরি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। একই ফ্ল্যাটে আমাদের ঠিকানা। তবুও দিনের পর দিন দুজনের দেখা হয় না। ওর শরীরের অনেক কিছুই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। না, ভুল বললাম শরীর নয়, শরীর তো সব মেয়েরই এক।

বলাকার শরীর ঘাঁটলে বিজুরির শরীরের কথাও মনে থেকে যায়। আসলে মুখ। বিজুরির মুখের কিছু কিছু জায়গা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যেমন সেদিন ডাক্তারের চেম্বারে বসেই খেয়াল হল, ওর তিলটা যেন কোন গালে? বাঁ না ডান?

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম—বাঁ।

চশমার ফ্রেম? গোলাপি না নীল?

সেটাও দেখতে গেছি, এমন সময় উল্টোদিকের চেয়ার থেকে ডাক্তার সামন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, এই যে মিস্টার, আমার দিকে তাকান। প্রবলেমটা কী আপনাদের?

বিজুরি তাড়াহুড়ো করে বলল, স্যার, ও, মানে অনাবিল, আমার হাজব্যান্ড, গতকাল সুইসাইড করতে গিয়েছিল। মেট্রোয় ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। কোনোরকমে প্লাটফর্মের অন্য লোকেরা আটকেছে।

বিজুরি যা বলল তা সত্যি কি না আমার জানা নেই। ওরকম কোনো ঘটনা আমার মনে পড়ছে না। তবে আমি অন্য একটা ঘটনা জানি। আমাদের বাথরুমের দেয়ালে বিজুরির প্রসাধনী রাখার যে পাল্লা দেওয়া ছোট আলমারিটা আছে, তার মধ্যে বিজুরি ক্রমাগত ভ্যালিয়াম আর অ্যালজোপাম জমা করে চলেছে। আমি যখনই ওটা খুলি, দেখি আগের চেয়ে একটা দুটো ফাইল বেশি। যেন শীতের আগে কাঠবেড়ালি গাছের কোটরে বাদাম জমাচ্ছে।

ডাক্তার সামন্তকে সেটাই বললাম।

ডাক্তার সামন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে যেভাবে নানান জ্যামিতিক নকশায় ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন আর মাঝে মাঝে হাত দিয়ে বাতাস কাটতে লাগলেন তাতে ওনাকে সামন্ত নয়, 'সামান' মনে হচ্ছিল। সামান মানে গুণীন টাইপের ব্যাপার। ধর্মগুরু আর ম্যাজিশিয়ানের মিশেল। তারা নাচে, গান গায়, মুঠো মুঠো ধুনো পোড়ায়, পায়রা বলি দেয়। ধড়ফড় করে মাটিতে পড়ে যায়। ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। তারপর সেই ভরের মধ্যেই আদিম মানব কিম্বা আদিবাসী মানুষদের নানান রোগের ওষুধ বলে দেয়।

সামন্ত আর সামান শব্দ দুটো যে এত কাছাকাছি সেটা হঠাৎ খেয়াল পড়ায় ফিক করে হেসে ফেললাম।

হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ ইউ? নাচানাচি থামিয়ে চোখ কুঁচকে জিগ্যেস করলেন সামান, স্যরি সামন্ত।

আমি বললাম, নাথিং স্যার।

যাই হোক, ডাক্তার সামন্ত তারপরে আমাদের নানান রকম প্রশ্ন করলেন। আমরা জানালাম, বিয়ের পর থেকে আমাদের একেবারেই দেখাসাক্ষাত হয় না, যদিও আমরা এক ফ্ল্যাটেই থাকি। তার কারণ আমরা দুজনেই আই টি সেক্টরে কাজ করি। আমার নাইট ডিউটি আর বিজুরির ডে। বিজুরি বাড়ি ফেরার আগে আমি অফিস চলে যাই, আমি বাড়ি ফেরার আগে বিজুরি অফিস চলে যায়। এই যে আজ এখানে একসঙ্গে দুজনে এসেছি, সে-ও বিজুরি ছুটি নিয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে।

বিজুরি বলল, আমরা বাঁচতে চাই ডাক্তারবাবু। আমি চাই না, সত্যিই কোনোদিন একসঙ্গে সবক'টা অ্যালজোপাম খেয়ে নিতে।

আমি বললাম, আমিও থার্ড রেলের ওপর শুয়ে শুয়ে শিককাবাব হতে চাই না স্যার।

ডাক্তার সামন্ত বললেন, তাহলে ছবি আঁকুন।

দুজনেই জিগ্যেস করলাম, কার ছবি স্যার? কিসের ছবি?

নাথিং ইন পার্টিকুলার। যা প্রাণে চায় আঁকুন। এইভাবেই অবচেতনের ভেতরের বিষগুলো সব বেরিয়ে যাবে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফিরে আসবে।

আমি অন্তত আধমিনিট হতবাক হয়ে বসে রইলাম। এ তো চল্লিশ হাজার বছর আগের নব্য প্রস্তর যুগের 'সামান'দের প্রেসক্রিপশন। আরে, এই কারণেই তো আলতামিরায়, ভীমবেঠকায় গুহার দেয়ালে দেয়ালে এত ছবি। এমনি এমনি ওরকম সব ভয়ঙ্কর প্রাণীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের ছবি আঁকা হত নাকি? তারপরে নগ্নিকা? অমন লার্জার দ্যান লাইফ স্তন, নিতম্ব, ভগদেশ! ক্যাথারসিস, ক্যাথারসিস। এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কিন্তু সেই প্রেসক্রিপশন আজ আবার চল্লিশ হাজার বছর বাদে এই সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে! এটা টু মাচ নয়?

ডাক্তার সামন্ত কী এবারে ফি নেওয়ার সময়ে পাঁচশো টাকার নোটের বদলে একটা পাথরের বল্লম চাইবেন? কিম্বা ম্যামথের মাংস?

যাই হোক, এইভাবেই আমাদের ছবি আঁকার শুরু। প্রথমে ড্রইং খাতা আর প্যাস্টেল কিনে এনে তাই দিয়ে আঁকা শুরু করেছিলাম। তাতে ঠিক ফুর্তি

পাচ্ছিলাম না। এইসব মিডিয়ামে ছবি আঁকলে আপনা আপনিই হাত থেকে ছোটবেলায় শেখা তিনকোনা পাহাড়, কাঁটা-ওলা সূর্য, কু ঝিক ঝিক রেলগাড়ি এইসব বেরিয়ে আসে। তাতে ডিপ্রেশনটা আরও চেপে বসে। মনে পড়ে যায় অনেকদিন সূর্য দেখিনি, পাহাড়ও না।

বিজুরি ফোন করে জানাল ওরও একই অবস্থা।

তারপর কেমন করে যেন অটোমেটিকালি আমরা ফ্ল্যাটের দেয়ালে ছবি আঁকতে শুরু করে দিলাম। তখন থেকেই ছবির চরিত্রও বদলে গেল।

প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে মাজা মসৃণ মাখন রঙের দেয়াল— সব মিলিয়ে তা ষোলোশো স্কোয়ার ফিট তো হবেই। প্রথম দিন আমি খুব সসঙ্কোচে সোফার পেছনে আড়াল হয়ে থাকা দেয়ালের টুকরোটায় একটা অ্যাক্সিডেন্টের ছবি আঁকলাম। টাটা সুমো আর লরি, হেড অন কলিশন। দুটোই দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত কিছু দেহ পাশে রাস্তায় শোয়ানো রয়েছে।

আঁকার পর নিজের মনেই ছবিটার তারিফ না করে পারলাম না। এর সমগোত্রীয় ছবি রয়েছে সাব-সাহারান আফ্রিকার উখালাম্বায়। গন্ডার শিকারের ছবি। সে-ও ভারি রক্তস্নাত হিংস্রতায় ভরা গুহাচিত্র।

আমি নাইট ডিউটি করে এসে দিনের বেলায় ঘুমোই। তাই আমাদের ফ্ল্যাটের সমস্ত জানলায় ভারি পর্দা টানা থাকে। সন্ধেবেলায় বিজুরি বাড়ি ফিরে সেই পর্দা আর সরায় না। বরং কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বেলে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। সারা দিন কম্পিউটার স্ক্রিনের ঔজ্জ্বল্যের দিকে চেয়ে থাকার পরে চোখ আর আলো সইতে পারে না। তাই আমাদের ফ্ল্যাটে চির আবছায়া। গুহার মতন। সেই আবছায়ার মধ্যে গাঢ় রঙে না আঁকলে ছবি ভালো ফোটে না। এটা আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরে গেলাম।

হ্যাঁ, আমরাই বলছি। কারণ ইতিমধ্যেই আমার আঁকা ছবিগুলোর আশেপাশে অন্য হাতে আঁকা কিছু কিছু ছবিও গজিয়ে উঠতে দেখছি। বিজুরির আঁকা সেই ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছবি আমার বেশ ভালো লেগেছিল। একটা কম বয়েসি ছেলেকে তিন-চারটে লোক ঘিরে ধরে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে মারছে। আর একটা মেয়ে, ওই আক্রান্ত ছেলেটার দিদিই হবে, সে বন্ধ ফটকের সামনে দু-হাত তুলে বাঁচাও বাঁচাও বলে সাহায্য চাইছে। ছবিতে তো আর চিৎকার শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবে বিজুরির আঁকার গুণে যেন তাও শোনা যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আবছায়া আলোয় প্যাস্টেল-কালার একেবারেই খুলছিল না। কী করি, কী করি? তারপর হঠাৎই একেবারে গুহাচিত্র আঁকবার অরিজিনাল মালমশলা হাতে চলে এল। অফিস থেকে ফেরার সময় দেখি খালপাড়ে বস্তি উচ্ছেদ হচ্ছে। মানে হয়ে গেছে। এখানে ওখানে পোড়া কাঠ, ভাঙা উনুন, তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই এইসব পড়ে রয়েছে। আমি টুক করে গাড়ি থেকে নেমে আমার যা যা প্রয়োজন সব তোয়ালেতে মুড়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে নিয়ে এক্কেবারে সোজা আমার ফ্ল্যাটে।

তারপর থেকেই আমাদের গুহাচিত্রগুলো কাঠকয়লার কালো, পোড়ামাটির লাল আর বিতাড়িত মানুষদের অভুক্ত শাকপাতা-সেদ্ধর সবুজ রঙে রঙিন হয়ে গেল। মনে হয় এগুলোও আগামী পঁচিশ তিরিশ হাজার বছর টিকে যাবে।

ইতিমধ্যে একদিন সেক্সের প্রয়োজন বোধ করায় আত্মহত্যার হেল্পলাইনে ফোন করলাম। ওরা কেন যে সোয়েট-শপটার এরকম নাম দিয়েছে কে জানে! 'আত্মহত্যার হেল্পলাইন'! আমি প্রথমবার সত্যিই ভেবেছিলাম বোধহয় কাউন্সেলিং সেন্টার-টেন্টার হবে। তারপর দেখি, ও বাবা, বেশ চমৎকার এক মেয়েমানুষ এসে হাজির। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই ওদের ডাকি। খুব যে ভালোলাগে তা নয়। তবে, ওই...ওদের মধ্যে দিয়ে বিজুরির শরীরটা ঝালিয়ে নিই।

আজকে যে এল, তাকে আমি মনে মনে নর্থ পয়েন্টের মা বলে ডাকি। আসলে এরা তো কেউই নামটাম বলতে চায় না। তবে আমার টেবিল থেকে নোটগুলো নিয়ে যখন ব্যাগে ঢোকাতে যায়, তখন প্রায়ই ওদের পার্স থেকে কোনো না কোনো স্কুলের পেরেন্টস আইডেন্টিটি কার্ড বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। আমি ভদ্রতাবশত সেগুলো কুড়িয়ে ওদের হাতে তুলে দিই। কোনোটা নর্থ পয়েন্টের, কোনোটা ভারতী শিক্ষাভবনের, কোনোটা মহাযোগী অ্যাকাডেমির। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাচ্চাদের স্কুলে ঢুকিয়ে ওরা জীবনটাকে উপভোগ করতে বেরিয়েছে। আবার স্কুল ছুটির সময় যথাস্থানে পৌঁছে, বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

তো নর্থ পয়েন্টের মা পূর্ণ যুবতী। চমৎকার শাঁসে জলে শরীরস্বাস্থ্য। গরিবি কিম্বা অপুষ্টির কোনো বালাই নেই। যেভাবে অবহেলায় নোটগুলো হাতে নেয় তাতে বোঝাই যায় ওর হাজব্যান্ড এরকম নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে পারে। তবে কী জন্যে আসা?

সে আমি বলতে পারব না। তবে একটা জিনিস দেখে অবাক হলাম,

ভালোও লাগল। আমার বিছানার মাথার কাছের দেয়ালে সবে মাত্র ঘন্টাখানেক আগে এক নায়িকার ছবি এঁকেছিলাম। পোর্ট্রেট নয়, অনেকটা সিল্যুয়েটের মতন। বুরুশে থ্যাবড়া করে রং তুলে পোঁচ বুলিয়ে আঁকা। গুহাচিত্রের শর্ত মেনেই সেই ছবিতে স্ত্রী যৌন অঙ্গগুলোকে অস্বাভাবিক বড় করে দেখিয়েছিলাম। আর্কিওলজিস্টদের ভাষায় এইধরনের মানবীচিত্রগুলোকে আদিখ্যেতা করে বিশ্বমাতৃকা বলে ডাকা হয়। তো, সেই ছবি দেখে নর্থ পয়েন্টের মায়ের কি যে হল। চোখ জলে ভরে উঠল। শুধু তাই নয়। দেখি তার স্তনবৃন্তে দুধের ফোঁটা জমছে। চোখের জলের ফোঁটা আর বুকের দুধের ফোঁটা একসঙ্গে টপটপ করে আমার গুহার মেঝেয় ঝরে পড়তে লাগল। আজকে আর টাকা নিল না সেই মেয়ে। তাড়াতাড়ি পোশাকটোশাক পরে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। সম্ভবত বাচ্চার জন্যে মন কেমন করে উঠেছে।

আজকাল যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, পুরো সময়টাই প্রায় ছবি এঁকে কাটাই। মনে হয় অফিস না গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা আঁকতে পারলে আরো ভালো লাগত। ছবি আঁকি, আর মনে মনে ডাক্তার সামন্তকে তারিফ করি। উনিই মনে হয় প্রথম আবিষ্কার করেছেন যে, আমরা যারা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করি, তারা আদতে গুহামানব। ওনার একটা ওয়েবসাইট আছে। সেটাতে এক দুই করে মিলগুলো দেওয়া আছে। সেগুলো হল যথাক্রমে—

এক, আদিম মানুষের ইতিহাস ছিল না, ভূগোল ছিল না, সাহিত্য ছিল না, দর্শন ছিল না। কেবল রিচ্যুয়ালস ছিল। মাল্টিন্যাশনালের চাকুরেদেরও তাই। তাদের রিচ্যুয়ালসের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে কেনাকাটা করা, কানে ইয়ারপ্লাগ গুঁজে গান শোনা ইত্যাদি বহুল প্রচলিত।

দুই, আদিম মানুষেরা ছোটি ছোটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল এবং গোষ্ঠির বাইরে চরম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। মাল্টিন্যাশনালের কর্মীরাও তাই। একরকমের পোশাক পরিধান, গোষ্ঠির মধ্যে প্রচলিত এক বিশেষ ধরনের সঙ্কর ভাষা ব্যবহার—এগুলি এদের গোষ্ঠির সঙ্গে একাত্ম করে রাখে। এদের গোষ্ঠিপতির নাম ম্যানেজার।

তিন, আদিম মানুষেরা টোটেম পুজো করত। কারুর টোটেম মাছ, কারুর টোটেম কচ্ছপ, কারুর বা জাগুয়ার। সেই টোটেমের চিহ্ন সারাক্ষণ তারা শরীরে বহন করে বেড়াত। মাল্টিন্যাশনালের কর্মীরাও তাদের চৌকোণা আই-কার্ডগুলি সারাক্ষণ শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। সম্ভবত প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার

সময়েও কোম্পানির লোগো আঁকা ল্যামিনেটেড কার্ডগুলি তাদের গলায় বা কোমরে শোভা পায়।

এইরকম সব আরকি। সবটা মনেও নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই অফিস থেকে ওয়ার্নিং খেলাম। বিজুরি এস এম এস করে জানাল ওরও একই অবস্থা। আসলে আমাদের গুহাচিত্রগুলো গুহার বাইরে বেরিয়ে পড়ছিল। অফিসের কম্পিউটারে আমেরিকান ক্লায়েন্টের জব ওয়ার্ক করে দেওয়ার বদলে আমরা অসাবধানে দুয়েকটা গুহাচিত্র পোস্ট করে দিচ্ছিলাম। আমি একবার একটা পারমানবিক বর্জ্য বোঝাই জাহাজ আঁকলাম, যেটা গুজরাটের সমুদ্র উপকূলে সেই বিষাক্ত বর্জ্য খালাস করছিল। বিজুরি এঁকেছিল চীনের গুয়াংডাও প্রভিন্সের খেলনা কারখানা। আঙুলে ক্ষত, নাকে রক্ত নিয়ে মেয়েরা সেখানে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির জন্যে ভ্যালেন্টাইনস হার্টে রং লাগাচ্ছে। প্রতি তিন সেকেন্ডে একটা হৃদয়ে রং লাগাতে হয় তাদের। তা না হলে পুরো দিনের মজুরিটাই জরিমানা হিসেবে কেটে নেওয়া হয়।

হিমযুগ। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছিল। আমরা দিনের পর দিন নিষ্ঠুর তুষারপাতের মধ্যে গুহাবন্দী হয়ে বসেছিলাম। আমাদের দৃষ্টি ছিল, দর্শন ছিল না। ভাষা ছিল, কবিতা ছিল না। জন্ম ছিল, অপত্য ছিল না। মৃত্যু ছিল, সৎকার ছিল না। সঙ্গম ছিল, ভালোবাসা ছিল না। আমাদের সময় কাটে কেমন করে?

আমাদের পাগল পাগল লাগছিল। একজন দুজন করে আমরা আত্মহত্যা করছিলাম।

ঠিক তখনই আমাদের 'সামান', আমাদের ওঝা, আমাদের জ্ঞানগুরু গুহার জটিল সুড়ঙ্গজালের শেষপ্রান্তে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সজারুর কাঁটার কুইল, বেজির লোমের তুলি, রক্তিম গেরিমাটি, সবুজ তামার আকরিক, কালো কাঠকয়লা। গুহার দেয়ালে মশাল জ্বেলে দিয়েছিল।

আমরা গুহাচিত্র এঁকেছিলাম। বাইরে তখন জমে যাওয়া বেরিংপ্রণালী পেরিয়ে ইয়োরোপের নেকড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছিল। শান্ত নিয়ান্ডারথাল মানুষদের শেষ প্রতিনিধিকে খুন করছিল হোমো স্যাপিয়েন্সেরা, খুনে বনমানুষের বংশধরেরা।

আমরা গুহাচিত্র আঁকছিলাম। বাইরে বাঁধের জলে ডুবে যাচ্ছিল মানুষের

ঘরবাড়ি। দৃষ্টিনন্দন ভাবে মরুভূমির আকাশে মিসাইল হানা চলছিল। কিশোর সাইকেল চোরকে লাইটপোস্টে বেঁধে তার চোখ উপড়ে নেওয়া হচ্ছিল। মেয়ের সামনে ধর্ষণ করা হচ্ছিল মাকে।

আঁকতে আঁকতে একদিন আমি অফিস যেতে ভুলে গেলাম। জানতাম চাকরিটা চলে যাবে। যাক। পরোয়া করি না।

আঁকতে আঁকতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হল। সন্ধে পেরিয়ে রাত।

ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে বিজুরি তার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, যেভাবে রোজই ঢোকে। তারপরে অবাক হয়ে দেখল আমি ভেতরেই আছি। ছবি আঁকছি।

বিজুরি ধূসর রং দিয়ে একটা হুইল চেয়ার এঁকে অফিসে চলে গিয়েছিল। আমি সেই চেয়ারটার ওপর ইচ্ছেসুখে লাল নীল রং লাগিয়ে সেটাকে একটা প্যারাম্বুলেটর বানিয়ে দিয়েছি। তাই দেখে, বিজুরি আজ চল্লিশ হাজার বছরের দূরত্ব পেরিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হাঁটু মুড়ে বসল আমার পাশে। কত যুগ বাদে ওর ঘন নিশ্বাস আমার কানের পেছনে এসে লাগল। আমি হঠাৎ ঘুরে প্রাণপণে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

বাইরে তুষারযুগের শেষ বরফকণাটা সেই মুহূর্তেই টুপ করে গলে পড়ল।
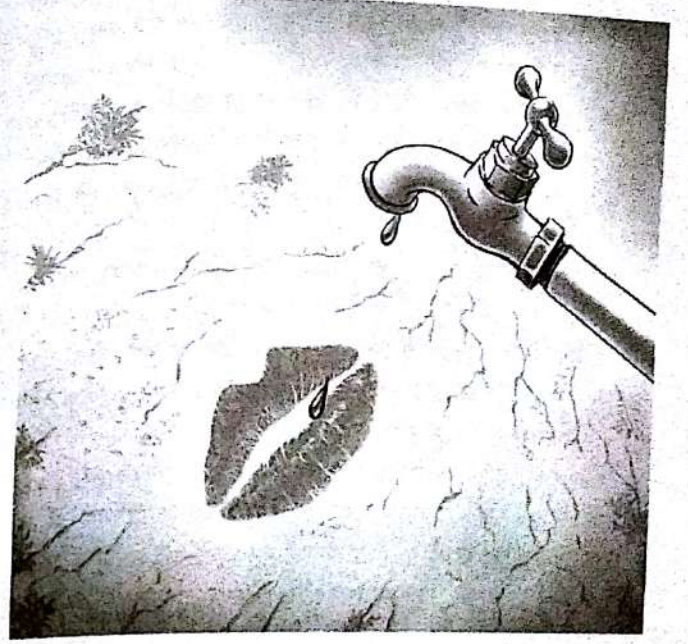
জলকষ্ট

এমনিতে আঠেরো বছর বাদে বীরশিবপুরের শ্রীরথীন ব্যানার্জির বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আমার কোনো দরকার ছিল না। গেলাম যে, স্বীকার করি বা নাই করি, তার পেছনে একটাই কারণ ছিল—আমার প্রথম প্রেম।

প্রেম কিম্বা এক নারীর শরীর। দুটোর তফাত আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়।

আঠেরো বছর আগে আমার জ্যাঠামশাইয়ের স্কুলের বন্ধু রথীনজেঠুর বাড়িতে দুটো রাত কাটিয়েছিলাম। আসলে বীরশিবপুর গ্রামের গায়েই অজয় নদ আর নদী পেরোলেই কেঁদুলির মেলা। তো, জ্যাঠামশাই যখন শুনলেন

আমি মেলা দেখতে যাচ্ছি, তখন উনিই বললেন—দ্যাখ তিনু, তুই সুখী প্রকৃতির ছেলে। ওসব মেলার আখড়ায় খড়ের বিছানার ওপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোনো টুমোনো তোর পোষাবে না। তাছাড়া আমি গিয়ে দেখেছি, চারদিকে বড্ড গাঁজার গন্ধ। যাচ্ছিস যা, তবে রাতটা বীরশিবপুরে রথীনের বাড়িতে কাটাস। ওদের ওখান থেকে মেলা হাঁটাপথে তিরিশ মিনিট। অবশ্য নদীতে জল বাড়লে নৌকা ধরে পেরোতে হয়। তখন আরেকটু বেশি সময় লাগে।

আমি জ্যাঠামশাইকে বললাম, ওরকম হুট করে অচেনা লোকের বাড়িতে গিয়ে ওঠা যায় না কি?

জ্যাঠামশাই অবাক গলায় বললেন, অচেনা বলছিস কাকে? রথীন তোর অন্নপ্রাশনে আসেনি? তাহলে? তাছাড়া ও গরিব হলেও দিলদার লোক। তুই শুধু ওর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়টা দিয়ে দ্যাখ না, কী করে।

সবদিক ভেবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। সত্যিই আমি শীতকাতুরে। আর কেঁদুলির মেলার শীত যে দার্জিলিংকে হার মানায় সে কথা আমি অনেক বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখেই শুনেছি। তাছাড়া মদ গাঁজা খাই না, কিন্তু আবার পাগলের মতন লোকগান ভালোবাসি। সবদিক মেলানোর জন্যে আঠেরোবছর আগে এক শীতের দুপুরে আমি পানাগড় স্টেশনে নেমে, বাস ধরে বীরশিবপুরে পৌঁছে, 'প্যাটেল পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি'র ওয়েল্ডার শ্রীরথীন ব্যানার্জির দরজায় কড়া নেড়েছিলাম।

দরজা খুলেছিল রথীনজ্যেঠুর মেয়ে পিয়ালি। তাকে দেখেই আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

তখন আমার তেইশ-বছর বয়স। সবে চাকরিতে ঢুকেছি। ওই বয়সে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট-টা খুব অস্বাভাবিক নয়। তার ওপরে পিয়ালির ছিল ভারি মমতামাখা দুটো চোখ আর চাবুক ফিগার।

সুখের কথা, পিয়ালি নামে সেই উনিশ-বছরের মেয়েটাও সেদিনই আমার প্রেমে পড়ে গেল...তবে ঠিক প্রথম দর্শনে নয়। মোটামুটি সত্তর-আশিবার চোখাচোখি, দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত, তিনটে লোকগীতি আর খান চারেক পূর্ণেন্দু পত্রী শোনাবার পর। বলাই বাহুল্য, সেসব গান কবিতা সবকিছুই ছিল যাকে বলে আহ্বানে আকুল। পিয়ালি রেজিস্ট করতে পারেনি।

তো সেই প্রথম দুটো দিন আর তার পরের এক বছরে ওখানে কাটিয়ে আসা আরো অনেকগুলো দিনের স্মৃতি যে এখনো ভুলতে পারিনি সেটা বুঝতে পারলাম এবার পানাগড় গিয়ে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমার বিয়ে-থা হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরেই আমি যাকে বলে ঘোর সংসারী। মাঝের এই আঠেরো বছরে পিয়ালি নামের সেই রোগা ফর্সা মেয়েটার মুখ আঠেরোবারও মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনের অদ্ভুত গতির কথা কে বলতে পারে? পানাগড়ে ব্র্যাঞ্চ-অফিস ইনস্পেকশনের কাজটুকু দুপুর দুপুর শেষ হয়ে যেতেই, মন বলল, চলো বীরশিবপুর! চলো, একবার দেখে আসবে পিয়ালিকে। নাহয় সন্ধের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরেই বাড়ি ফিরবে। লোকাল ট্রেনে ঘটর-ঘটর করে পাঁচঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছোনোর চেয়ে সেই জার্নিটা বেশি আরামদায়কও হবে, তাই না?

এইসব উলটোপালটা বুঝিয়ে মন আমাকে পথে নামাল। কাউকে কিছু না বলে বর্ধমানগামী বাসে উঠে বসলাম। যদ্দুর মনে পড়ছে, আগের বার ওখানে পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল। এবারে সময় লাগল আরো দশ মিনিট কম, কারণ, ইতিমধ্যে রাস্তার অনেক উন্নতি হয়েছে।

বীরশিবপুর বাসস্ট্যান্ডে নেমে দেখলাম কিছুই প্রায় বদলায়নি। সেই মোরাম-রাস্তার দুপাশে কদম, বাবলা আর নিমের ছায়ার আড়ালে ক্যানালের জলের ঝিকিমিকি। এখানে ওখানে দু-চারটে নতুন একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন বলতে ওইটুকুই। শেষ বিকেলের হলুদ রোদ গায়ে মেখে, পাখির ডাক শুনতে শুনতে পা চালালাম ছোট্ট গ্রামটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ দোতলা বাড়িটার দিকে। ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি। ব্যানার্জিবাড়ির রাস্তা দিব্যি মনে আছে।

কিছুটা যাওয়ার পরে হঠাৎ আমার মনে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একটা বিপরীত চিন্তা খেলা করে গেল। মনে হল, ধুর, এ কি পাগলামি করছি? পিয়ালি কি এখনো আমার জন্যে বাপের বাড়িতে বসে আছে নাকি? কবেই নিশ্চয় বিয়ে-টিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। তাহলে আজ কার জন্যে ওখানে যাচ্ছি?

অন্য একটা মন বলল, শোনো তিনু। নাহয় আজ তার শ্বশুরবাড়ির খোঁজটুকুই নিয়ে এলে। জেনে এলে সে সুখে আছে, ভালো আছে। সেটুকুই

যদি জানতে পারো, তোমার ভালো লাগবে না? একদিন ভালোবেসেছিলে তো তাকে।

আরেকটা মন বলল, আঘাতও তো করেছিলাম। ছেড়েও তো এসেছিলাম তাকে খুব তুচ্ছ একটা কারণে। তাহলে?

প্রথম মন উত্তর দিল, মেয়েদের ক্ষমা করার ক্ষমতা তুমি জানো না, তাই সঙ্কোচ করছ। ওদের ওই ক্ষমাটুকু না পেলে সংসার অচল হয়ে যেত। তুমিও পাবে, চিন্তা কোরো না। আজ শুধু সুযোগ পেলে একবার তাকে বলে এসো—স্যরি। ওই শব্দটা বলার জন্যে আঠেরোবছর মোটেই কিছু বেশি সময় নয়।

আশ্চর্য ব্যাপার, পিয়ালিকে তার বাপের বাড়িতেই পেলাম। এবারেও পিয়ালিই দরজা খুলল, তবে আগের বারের মতন দুবার কড়া নাড়ার পরেই নয়। কড়া নাড়তে নাড়তে যখন হাতে ব্যথা হয়ে গেছে, ভাবছি ফিরে যাব কিনা, তখনই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে ওদের সদর দরজাটা খুলে গেল। খিল খোলার কিম্বা ছিটকিনি নামানোর আওয়াজ পেলাম না। কেমন যেন মনে হল, বাইরে থেকেই একটা জোরালো হাওয়া ধাক্কা মেরে রংচটা কাঠের পাল্লাদুটোকে খুলে দিল। যাইহোক, দরজায় যে দাঁড়িয়েছিল তাকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। কারণ, বিগত আঠেরো বছরে তার শরীরে মুখে কোনো বদলই আসেনি।

রোগা মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকসময় এরকম হয়।

পিয়ালি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, এসো তিনুদা। ভেতরে এসো। হঠাৎ আজ এতদিন বাদে এমন হুট করে চলে এলে যে?

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, এবার জ্যাঠামশাইয়ের ফোন নম্বরটা নিয়ে যাব। আসবার আগে জানিয়েই আসব।

স্বীকার করি, এই মন্তব্য একশোভাগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, আমি ততক্ষণে দেখে নিয়েছি পিয়ালির সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতেও নেই কোনো এয়োতির চিহ্ন। ও কি কুমারী নাকি বিধবা? নাকি ডিভোর্সি? যাই-ই হোক, ওকে আবার নতুন করে ভালোবাসা যায়। নতুন করেই ভালোবাসব ওকে।

এখন থেকে আমাকে আপিসের কাজ নিয়ে মাসে একবার করে পানাগড় যখন আসতেই হচ্ছে, তখন কেন পুরোনো প্রেম কিম্বা পুরোনো ইন্টুমিন্টু আবার ঝালিয়ে নেব না?

সেবার বড় তুচ্ছ কারণে মেয়েটাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। কবুল করছি, ওরকম নবাবী আরো কয়েকটা মেয়ের সঙ্গেও করেছিলাম। একটা মেয়েকে তো প্রোপোজ করতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই সে গুড়ুম করে একটা ঢেকুর তুলল। আমিও ধুত্তোর বলে চলে এলাম। আর সেই মেয়েটার মুখদর্শনও করিনি কখনো।

তবে কথা হচ্ছে কি, ওসব লাক্সারি একজন তেইশ বছর বয়সের এলিজিবল ব্যাচেলরকেই মানায়। এখন একচল্লিশ বছরে পৌঁছিয়ে মেয়েদের মনে হয় বড়ই মহার্ঘ্য। একটু-আধটু ঢেকুর কিম্বা নিশ্বাসের দুর্গন্ধ এখন দিব্যি সহ্য করে নেব।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকালাম।

হিসেব করে দেখলে হয়তো আগের ফেজে সব মিলিয়ে মাত্র পনেরো ষোলোটা দিনরাত্রি এই বাড়িতে কাটিয়েছিলাম। কিন্তু অত তীব্র দিনরাত তো তার আগে বা পরে আর যাপন করিনি। তখন তো ভাবতাম, এই বাড়িটাই একদিন আমার শ্বশুরবাড়ি হবে। যা দেখতাম সবকিছুই তাই ভালোবেসে বুকের ভেতরে শুষে নিতাম। কিন্তু সেই স্মৃতির জলছবির সঙ্গে কিছুই প্রায় মিলছিল না।

সদরের পরেই ছিল ভিতরবাড়ির চৌকোনা উঠোন। সেই উঠোনের তিনদিকে ঘোরানো দালানের গায়ে ছ'টা ঘর আর চতুর্থদিকে কলতলা আর বাথরুম। ঘোরানো দালানে তেলসিঁদুরের মতন চকচকে লাল সিমেন্টের মেঝে ছিল। ঘরগুলোর দরজায় জ্যাঠাইমার নিজের হাতে পুরোনো শাড়ি কেটে বানানো পর্দা ছিল। উঠোনের তারে টিয়াপাখির খাঁচা ঝুলত। কলঘরের ছাদে একটা শুকনো শিমের লতা ছিল। হ্যাঁ, নদীর ধারে বাড়ি, তবু বীরশিবপুরে জলকষ্ট ছিল খুব। সেইজন্যেই শিমগাছটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

ঘরটর এখনো আছে কিন্তু অন্য অনেক কিছুই নেই।

পিয়ালি আমার পেছনে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতেই পুরো দালান অন্ধকারে ঢেকে গেল। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, তাই উঠোনের ওপরের আকাশে আর আলো ছিল না। বাড়ির ভেতরেও আর কোথাও আলো জ্বলছিল না, শুধু পশ্চিমের একটা দরজা দিয়ে একটা হলুদ আলোর চৌখুপি এসে পড়েছিল সামনের দালানে। যেন একটা ছেঁড়া তাস ভুল করে কেউ প্যাকেটের বাইরে ফেলে রেখে গেছে।

সেই আলোতেই দেখতে পাচ্ছিলাম—একদার সেই লাল মেঝের দালান ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। উঠোনের অবস্থা আরো করুণ। জায়গায় জায়গায় তুলসী আর সন্ধ্যামনির ঘন ঝোপ মাথা চাড়া দিয়েছে। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই একটা বেজি গদাইলশকরি চালে উঠোনের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেল।

আমি বললাম, কী ব্যাপার বলো তো পিয়ালি? তখন জলের আকালে একটা শিমগাছও বাঁচত না। ছোলা ভেজানোর জলটুকু যাতে বাঁচানো যায় তার জন্যে টিয়াপাখিটাকে দিনের পর দিন শুকনো ধান খেতে দিতে। আর এখন এত স্বাস্থ্যবান সব ঝোপঝাড় গজাচ্ছে কেমন করে?

পিয়ালি বলল, ওমা! চিরকাল একইরকম কাটবে নাকি? তুমি চলে যাওয়ার পরেপরেই হাটতলায় ডিপ-টিউবওয়েল বসল তো। তখন থেকেই আমাদের ঘরে জলে ভাসাভাসি কাণ্ড। যদি আর ক'টা দিন আগে এমন জল আসত গো!

পিয়ালির দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে আমার দীর্ঘনিশ্বাস মিশে গেল। ও ঠিকই বলেছে। তখন বীরশিবপুরে জলের সুখ থাকলে, সেই উপচে পড়া জলের সঙ্গে আমাদের জীবনটাই হয়তো অন্য খাতে বয়ে যেত।

আমার ভাবনা অবশ্য একটু পরেই অন্যদিকে মোড় নিল। সারা বাড়িতে এমন অলক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা কেন? জলের সঙ্গে এসবের তো কোনো সম্পর্ক নেই। আঠেরো বছর আগেও এনাদের অভাবের সংসার ছিল। তবু তার মধ্যেই পিয়ালি আর জ্যাঠাইমা মিলে সংসারটাকে কী অদ্ভুত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন। তখন এই বাড়িতে পাড়ের সুতো দিয়ে বোনা কাঁথা ছিল, পুরোনো শাড়ি কেটে বানানো পর্দা ছিল। কত বই ছিল, গানের ক্যাসেট ছিল। অল্প কয়েকটা বাসন সোনার মতন ঝকঝক করত। অল্প কয়েকটা সস্তা

কাঠের আসবাব মা-বেটির মোছামুছির চোটে আরশোলার পিঠের মতন চকচক করত।

পেছন ফিরে দেখলাম, পিয়ালি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার মাথায় প্রসঙ্গত যে-প্রশ্নটা ঘুরছিল, সেটাই করে বসলাম। জ্যাঠাইমা কোথায়?

পিয়ালি আঙুল তুলে আকাশের দিকে দ্যাখাল। ঠোঁটে মজা পাওয়ার মতন হাসি।

আমি জিগ্যেস করলাম, সেকি! কবে?

পিয়ালি বলল, হয়ে গেল পনেরো বছর।

জ্যাঠামশাই?

ওই ঘরে আছেন। আলো জ্বলা ঘরটার দিকে ইশারা করল পিয়ালি। তারপর বলল, বাবা অন্ধ হয়ে গেছে। একটা ওয়েল্ডিং রড চোখের সামনে ফেটে গিয়েছিল। সে-ও সাতবছর হয়ে গেল। তখন থেকেই আমি এখানে থাকি। নাহলে বাবাকে দেখবে কে?

তার মানে পিয়ালির বিয়ে হয়েছিল। বরকে ছেড়ে এসেছে? নাকি বরও মারা গেছে? যাই হোক, পরে জানা যাবে। আপাতত আনন্দের খবর এইটুকুই যে পিয়ালি এখানেই থাকে। অন্ধের চোখের সামনে একা। আর পিয়ালি আগের মতনই মোহময়ী।

আমি হাতের অ্যাটাচিটা নামিয়ে রেখে জুতো খুলে পায়ে পায়ে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে ঢুকলাম। না ঢুকলেই ভালো করতাম বোধহয়। সে যে কী কী নরকের মতন ঘর, কি যে বিকট গন্ধ, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্তূপীকৃত ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা বালিশ আর তেলচিটে মশারির ওপরে হেলান দিয়ে বসে সাঁইসাঁই শব্দ করে যে কঙ্কালটা শ্বাস নিচ্ছিল তাকে দেখে আঠেরো-বছর আগের রথীন ব্যানার্জি বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কেমন আছেন, জ্যাঠামশাই?

কে?—সরপড়া ছলছলে চোখদুটো আমার দিকে ফিরিয়ে উনি প্রশ্ন করলেন।

আমি তীর্থঙ্কর, জ্যাঠামশাই। তিনু। উত্তরপাড়ার বাসুদেব মুখার্জির ভাইপো। মনে পড়ছে। আগে আপনাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছি। মনে পড়ছে?

লিচুর শাঁসের মতন মণিহীন চোখদুটোয় হঠাৎ লিচুর খোসার রং ধরল। ফিসফিস করে বললেন, মনে পড়বে না? তুমিই তো আমার সর্বনাশ করে গেলে। আমার মেয়েটাকে...

উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি লাঠির বাড়ি খাওয়া নেড়িকুকুরের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলাম, পিয়ালি মুখে আঁচলের খুঁট চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হাসছে। অবশ্য হাসিটা সামলেও নিল খুব তাড়াতাড়ি। বলল, চলো, ওদিকে গিয়ে বসি। আজ রাতটা থাকবে তো? তাহলে বাবাকে বলি, রতুদার দোকানে আরও ক'টা রুটি বাড়তি দেওয়ার কথা বলতে। রুটিই খাও তো রাতে?

জিগ্যেস করলাম, হোমপ্যাক কেন? তুমি রান্না করো না?

আমি আর আগুনের সামনে বসে রুটি বানাতে পারি না। কিছুই পারি না আমি আর।

একটা হাহাকারের মতন, অজয়ের চরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা শুকনো হাওয়ার মতন, পিয়ালির এই কথাগুলো উঠোনের বুনো ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, পিয়ালির কথাটার একটু ব্যাখ্যা নেওয়া ভীষণ জরুরি। বাইরে থেকে ওকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আজও ওর আঁচলের আড়াল ভেদ করে জেগে আছে অনম্র দুই স্তন, যেমন আগেও দেখেছি। ধোপার পাটের মতন মসৃণ মেদহীন তলপেটে গভীর নাভি—যেমন আগেও দেখেছি। কী এক ম্যাজিকের গুণে যেন কাল ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। তবু মেয়েদের শরীরে কতরকমের গোপন রোগ যে থাকতে পারে, সেটা আমার বউকে দেখেই শিখেছি। যদি পিয়ালিও অসুস্থ হয় তাহলে আমি এখানে সেকেন্ড ইনিংস চালু করার প্ল্যানটা ক্যানসেল করে দেব। আমি মজা চাই। নতুন করে ঝক্কিঝামেলা চাই না।

তবে প্রশ্নটা করতে হবে খুব সাবধানে। প্রশ্নের পেছনে লুকিয়ে থাকা ধান্দা যেন ধরতে না পারে। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম, না, পিয়ালি। আজ আমি একটু পরেই ফিরে যাব। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি। তোমাকে আজও ভালোবাসি বলেই জিগ্যেস করছি...রুটি বানাতে পারো না কেন? শরীর খারাপ?

ও মুখ নীচু করে উত্তর দিল—শরীরে আর কিছু নেই তিনুদা।

তারপর হঠাৎই বলল, শুধু ঠোঁটদুটো রয়েছে তিনুদা। আঠেরো বছর ধরে শুধু দুটো ঠোঁট তোমার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। সেই যে চুমুটা তুমি খেতে চেয়েছিলে, খেতে পারোনি, সেই চুমুটা তোমাকে দেওয়া জন্যে।

আমি একটা কাঠের চেয়ারের ওপরে বসেছিলাম। পিয়ালি দাঁড়িয়েছিল আমার পিছনে, চেয়ারের পিঠের ওপরে দুটো হাত রেখে। ও হঠাৎ এগিয়ে এসে নিজের বরফের মতন ঠান্ডা দুটো হাতের তালুতে আমার মুখটা ধরে ওপরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আমি দেখলাম পিয়ালির শান্ত দুটো চোখ। দেখলাম পিয়ালি আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, সিলিং-এর হুকের সঙ্গে বাঁধা একটা রাবারের টিউব গলায় লাগিয়ে ঝুলছে। গলাটা এখন জিরাফের মতন লম্বা, তাই আমার ঠোঁটের নাগাল পেতে ওর অসুবিধে হচ্ছে না।

বরফকুচির মতন দুটো ঠোঁট আমার ঠোঁটের ওপরে চেপে বসতেই আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওর মুখটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলাম। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা রাবারের গন্ধে আমার আবার সস্তার কনডোমের কথা মনে পড়ে গেল—এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সদর দরজার দিকে দৌড়লাম।

একটা কমবয়সি ছেলে হাতে রুটি তরকারির প্যাকেট নিয়ে সবেমাত্র দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি দৌড়ে বেরোতেই তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সে অবাক গলায় প্রশ্ন করল—কী হল?

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, এই বাড়িতে কে কে থাকেন জানো?

কে কে আবার কী? একজনই থাকেন তো, রথীন জেঠু। ওনার মেয়ে, মানে পিয়ালিদি তো সেই কবেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। তারপর কাকিমাও বোধহয় ওই শকেই মারা গেলেন। এখন উনি একেবারে নিরম্বু একা। আমি মাসকাবারিতে দুবেলার খাবার দিয়ে যাই।

বাসস্ট্যান্ডের দিকে জোরে পা চালাতে চালাতে ভাবলাম রতুদার দোকানের ছেলেটা একটু ভুল বলল। গলায় দড়ি নয়, গলায় রাবারের টিউব। টাইম-কলের জল চলে যাওয়ার পরেও যে টিউবটা ট্যাপের মুখে লাগিয়ে

পাইপের ভেতর থেকে চুষে চুষে জল বার করত পিয়ালি, সেটাই গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়েছিল। আমি এলে জল একটু বাড়তি খরচ হত কিনা, তাই ওইভাবে পিয়ালি বালতি ভরত আর সারাদিন ওর মুখের ভেতরটা ভরে থাকতো রাবারের গন্ধে।

আঠেরো বছর আগে ওকে প্রথমবারের জন্যে চুমু খেতে গিয়ে ওই গন্ধ সহ্য করতে না পেরেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

মেয়েটা এখনো মুখে সেই গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কলঙ্কভাগী

ফুলকি একরকম দৌড়তে দৌড়তেই জবাপিসির রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, জবাপিসি দরজার দিকে পেছন ফিরে, পিঁড়ির ওপর বসে কী যেন একটা বাটনা বাটছে। জবাপিসির শরীরের পেছনদিকটা দেখে ফুলকি কিছুক্ষণের জন্যে ভুলেই গেল, সে কী বলতে এসেছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভাবল—কী সুন্দর পিসির কোমরটা, কি গভীর পিঠের খাঁজ! একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবল, আমার যে কবে অমন হবে!

দেরি আছে, ফুলকি জানে। যদিও তার বয়স তেরো, কিন্তু এখনও সে ঋতুমতি হয়নি। শরীরটা তার একটু বেটাছেলে মার্কা, হাড়সার। স্বভাবটাও

ওই—যাকে বলে গেছো মেয়ে। সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুটন্ধু বেশি নেই।

জবা নিশ্চয়ই ফুলকির পায়ের আওয়াজ পেয়েছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাই দরজার দিকে তাকাল। হলুদমাখা হাতের উলটোপিঠ দিয়ে কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে জিগ্যেস করল, কী রে হাঁপাচ্ছিস কেন?

জবাপিসির মুখের দিকে তাকিয়ে ফুলকি আবার ভুলে গেল, সে কী বলতে এসেছিল। পিসির মুখটা কি সুন্দর! ছোট্ট পানপাতার মতন মুখ। চোখের পাতা বকনা-বাছুরের চোখের পাতার মতন ঘন। ঠোঁট দেখলে মনে হয় যেন বিষপিঁপড়ে কামড়িয়েছে। ফুলকি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল, আমার যদি অমন লাল-লাল, ফোলা-ফোলা ঠোঁট হত!

তারমধ্যেই ফুলকি একবার চট করে দেখে নিল, জবাপিসির কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম জমে আছে। যদিও ফাল্গুনের হাওয়াতে এখন এতটুকু তাপ নেই।

আগের দিন দুপুরেই মা, চন্দনাকাকি, বিনতাকাকি, ওরা ফুলকিদের পেছনের ঘরে বসে ন'তাসের বিন্তি খেলতে খেলতে জবাপিসির শরীরের অত্যধিক ঘাম নিয়ে কথা বলছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। ফুলকি আড়ি পেতে শুনছিল। পুরোটা বুঝতে পারেনি, তবে মনে হয়েছিল বিয়ের পরে বর-বউ যে অসভ্যতা করে, তার সঙ্গে ঘামের সম্বন্ধ রয়েছে। বিনতাকাকি একবার বলল, অমন একটা সোমত্থ মেয়ের শরীরের গর্মি,কুঠে প্রদীপের সাধ্য কী ঠান্ডা করে।

'কুঠে প্রদীপ' কথাটা সেদিনই প্রথম শুনল ফুলকি। শুনে একটু চমকে উঠল। সত্যিই কি প্রদীপপিসের কুষ্ঠ হয়েছে নাকি? দেখে তো সেরকম মনে হয় না। কুষ্ঠরুগি অনেক দেখেছে ফুলকি। তারা মঙ্গলাকালীর মন্দিরের সিঁড়ির নীচে বসে থাকে, ন্যাকড়া-জড়ানো হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়। তাদের বোঁচা নাক, চোখের পাতা নেই। প্রদীপপিসের তো দিব্যি মোটাসোটা ফর্সা তেল-চুকচুকে চেহারা। তবে হ্যাঁ! ইদানিং ওনার নাকের পাটাটা কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগে। ফোলা আর লালচে।

বিনতাকাকির বাকি কথাগুলো, মানে ওই শরীরের গর্মি, ঠান্ডা করা, ওসবের মানে বেশ বুঝতে পেরেছিল ফুলকি। বুঝতে পেরে তার মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। সে তখন বইয়ের দিকে মুখটা ঝুঁকিয়ে প্রাণপণে পড়ায় মন

ফেরানোর চেষ্টা করেছিল।

জবাপিসি আবার তাড়া লাগাল—কী রে ফুলকি? ওরকম হাঁদার মতন মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? কিছু বলবি?

ফুলকির মনে পড়ে গেল, সে কী বলতে এসেছিল। তাড়াহুড়ো করে বলল, পিসি, দেখে যাও একবার।

কোথায় যাব?

পেছনের বাগানে। চলো না! দেখে চমকে যাবে।

জ্বালাতে পারিস, সত্যি! জবার ঠোঁটদুটো নীচের দিকে বেঁকে গেল।

জবা জানে, ফুলকি মেয়েটা এরকমই। সারাক্ষণ বনে-বাদাড়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কোন পাখির বাসা, কোথায় মৌচাক, কোথায় কুঁচফল, নোনা আতা—সব নখদর্পণে। মেয়েটা গাছপালা পাখি পোকামাকড় এইসব ভালোবাসে। জবাদের বাগানেই সারাদিন আপনমনে ঘুরে বেড়ায় আর থেকে থেকে জবার রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ডাক দেয়, পিসি! তোমাদের বাথরুমের ঘুলঘুলিতে দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে দেখেছ? পিসি! মাটি ফুঁড়ে কেমন নাগচম্পার ফুল ফুটেছে দেখে যাও।

যদিও জবার শরীরে-মনে অনেক জ্বালা, যদিও জবার মেজাজ সারাক্ষণ তিরিক্ষে হয়ে থাকে, তবু সে এই তেরো বছরের বাচ্চা মেয়েটার ওপর রাগতে পারে না। ক্যাটক্যাট করে কথা শোনায় বটে, তবে আবার ওর ডাকে সাড়া দিয়ে এটা ওটা দেখতেও যায়। ভাবে, আর ক'টা দিন? আর একটু বড় হয়ে গেলেই তো বেচারার জঙ্গলে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে জবা উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে, আঁচলে হাত মুছে বলল, চল তাড়াতাড়ি। বাবুর ফেরার সময় হয়ে গেছে। তার জন্যে এখন পিন্ডি রাঁধতে হবে।

অন্য সব বাড়ির চেয়ে এ-বাড়িতে রান্নাবান্না হয় দেরিতে। তার কারণও আছে। প্রদীপ দত্ত হাটতলার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন দুপুর আড়াইটেয়। তারপর কর্তাগিন্নির স্নান-খাওয়া। জবার বাচ্চাকাচ্চাও নেই যে, তাদের জন্যে তাড়াতাড়ি রাঁধতে হবে।

ফুলকি জবাপিসির হাতে টান দিয়ে দাওয়া থেকে নেমে বাগানের রাস্তা ধরল।

দত্তবাড়ির বাগানের রাস্তায় দুপুরের রোদে ভাপ উঠছে। সেই ভাপের সঙ্গে মিশে গেছে পুটুশপাতার ঝিমধরানো গন্ধ। গাছগাছালির নীচে ধর্ষণচিহ্নের মতন আলোছায়ার ছেঁড়া অন্তর্বাস। ফুলকি চলল বাড়ির পেছনের দিকে, যেদিকে বেড়ার ওপাশে বাঁশবাগান আর পোস্তপানায় ছাওয়া সবুজ ডোবা। ফুলকির পেছন পেছন জবাও চলল। তার পায়ে গোলাপি প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। ফুলকির মনে হল, এখনো যেন দুধে আলতার ছোপ লেগে রয়েছে জবাপিসির ফর্সা পায়ের পাতায়, যদিও ওদের বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় তিনবছর হল।

চালতাগাছের পাতার আড়াল থেকে একটা বেনে বউ ডেকে উঠল—খোকা হোক। খোকা হোক। চলা থামিয়ে জবাপিসি ঘেন্নার চোখে পাখিটার দিকে তাকাল। পাখিটা একটা বড়সড় সবুজ শুঁয়োপোকা তার কমলারঙের দুই ঠোঁটের মধ্যে টিপে ধরে উড়ে চলে গেল পাটোয়ার-বাগানের দিকে।

জবাপিসিকে সঙ্গে নিয়ে ফুলকি থামল গিয়ে একেবারে প্রদীপপিসের পুজোর ঘরের জানলার নীচে জড়ো করে রাখা ইটের পাঁজাটার কাছে। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল।

জবা অবাক গলায় বলল, কী আছে ওখানে? নোংরা কিছু নয় তো? আমার কিন্তু চান হয়ে গেছে।

ফুলকি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় জবাপিসিকে তার পাশে বসতে বলল। জবা বসল। তখন ফুলকি আঙুল দিয়ে ইটের পাঁজার ভেতরে একটা খোঁদলের দিকে দেখাল। জবা দেখল, শ্যাওলা জমা মাটির ওপরে লেবুর আচারের মতন দেখতে দশ-বারোটা ডিম।

কিসের ডিম রে? ফিসফিস করে জিগ্যেস করল জবা।

গোখরোর। ফুলকিও ফিসফিস করে উত্তর দিল। আমি কদিন ধরেই মা-সাপটাকে এখানে ঢোকা-বেরোনো করতে দেখছি। আজ একটু আগে বেরিয়ে যেতেই আমি তোমাকে ডাকতে দৌড়েছি।

কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে জবা নিজের মনেই বলল, কী সুন্দর না ফুলকি?

সুন্দর। ফুলকি একটু চিন্তা করল। জবাপিসি ওই ডিমগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায় খুঁজে পেল? একটু পরে জবা বলল, আমার গা শিরশির করছে। মা-টা যদি ফিরে আসে। চল পালাই।

পিসি! ফেরার পথে ফুলকি ডাকল।

বল!

তুমি এবার কী করবে? মুনিষকে বলবে নাকি পাঁজাটা ভেঙে ডিমগুলো নষ্ট করে ফেলতে?

সে কথার জবাব না দিয়ে জবা উলটে ফুলকিকে প্রশ্ন করল, তুই তো সারাক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিস। বলতে পারিস, গোখরোর বাচ্চাদের বিষ থাকে কি না?

থাকে না? ফুলকি ঘুরে দাঁড়াল। জবার চোখে চোখ রেখে বলল, মায়ের যতটা বিষ থাকে ছায়েরও ঠিক ততটাই থাকে। একবার ছুবলে দিলেই...ফুলকি ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে এতটা জিভ বার করল।

কী খায় ওরা?

ডেঁয়ো পিপড়ে খায় পিসি। সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পিসি!

ডাক শুনে জবা চমকে তাকায়। দেখে, তাকে রান্নাঘরে দেখতে না পেয়ে ফুলকি এখানে চলে এসেছে...এই ঠাকুরঘরে।

কী করছ গো পিসি? ফুলকি পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে আসে। হঠাৎ জবা প্রচণ্ড খেপে ওঠে। চিৎকার করে বলে, মুখপুড়ি মেয়ে! আদাড়-বাদাড় ঘুরে বাসি কাপড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে এলি যে? বেরো, বেরো বলছি এক্ষুনি।

ফুলকি এতদিন জবাপিসির পায়ে পায়ে ঘুরছে; এরকম ব্যবহার পিসির কাছ থেকে সে কোনোদিন পায়নি। সে দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে, পায়ে পায়ে নিজের বাড়িতে ফিরে চলল। তার কান্না পাচ্ছিল খুব, কিন্তু কাঁদতে পারছিল না। কান্নাকে ছাপিয়ে অন্য একটা অনুভূতি তার বুকের ভেতরে পাক খেয়ে উঠছিল। তার নাম বিস্ময়।

ফুলকি বিস্মিত, কারণ, ওই এক লহমার মধ্যেই সে দেখে নিয়েছিল জবাপিসি ঠাকুরঘরে কী করছিল। পুজো করছিল না জবাপিসি। পিসের পুজোর জোগাড়ও করছিল না। জবাপিসি বাগানের দিকের জানলা থেকে

ঠাকুরের আসন অবধি মুঠোয় করে বাতাসার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

কেন?

দুদিন আগে ইটের পাঁজার ভেতরে গোখরোর ডিম ফুটেছে। ফুলকি জবাপিসিকে সঙ্গে করে দেখিয়ে এনেছিল ডিমের চুপসে যাওয়া ছেঁড়া খোসাগুলো। বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পায়নি। সেটাই স্বাভাবিক। সাপের বাচ্চারা একজায়গায় থাকে না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জবাপিসি জিগ্যেস করছিল, ছানাগুলো কোথায় গেল রে ফুলকি?

ফুলকি বলেছিল, শুকনো বাঁশপাতার নীচে লুকিয়ে আছে মনে হয়। ইটের পাঁজার আড়ালেও কয়েকটা থাকতে পারে।

ঘরে ঢুকবে না তো?

ফুলকি বলেছিল, কেন ঢুকবে? তোমার ঘরে কি ওদের খাবার আছে? সেদিন ছিল না। আজ ফুলকি দেখে এল—আছে। পিসের ঠাকুরের আসনের চারপাশে বাতাসার টুকরোর ওপরে থিকথিক করছে ডেঁয়োপিপড়ের দঙ্গল। ওরাই তো গোখরোর বাচ্চার খাবার।

জবাপিসি বাতাসার টুকরো ছড়িয়ে ওদের বাগান থেকে ডেকে এনেছে। কেন? পিসি কী বুঝতে পারছে না, এতে বিপদ বাড়ছে? ডেঁয়োপিপড়ের পেছন পেছন সাপের বাচ্চাগুলোও ঘরের মধ্যে চলে আসতে পারে।

ফুলকি তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন অভিমানে জবাপিসির কাছে যায়নি, কথাও বলেনি। কিন্তু কতদিন না গিয়ে থাকবে? ওইখানেই তো যত সাপ, বড় বড় মাকড়শা, গিরগিটি। ওই বাড়িতেই তো জবাপিসি, যার শীতকালেও ব্লাউজের বগল ঘেমে ওঠে। প্রদীপপিসে, যার নাকটা তো ফুলে উঠছে বটেই, ইদানিং গায়ে ফোসকাও বেরোচ্ছে।

একদিন তাসের আড্ডায় চন্দনাকাকিমা বলল, কী সর্বনেশে কথা মা? বেশ্যাবাড়ি থেকে রোগ ধরিয়ে আনবে, আর সেই রোগ ঢুকিয়ে দেবে বউটার শরীরে?

মা বলল, মেরে পুঁতে ফেলতে হয় এইসব বেটাছেলেদের। ঘেন্না, ঘেন্না। জবাটার জন্যে ভয়ে আমার প্রাণটা শুকিয়ে যায় দিদি।

বিনতাকাকিমা বলল, ওষুধ নেই নাকি মাইমা ওই অসুখের।

রাসের দিদা পরপর মাদুরের ওপর চিড়েতনের টেক্কা আর ডাবরে পানের

পিচ ফেলে বললেন, কলকাতায় খিদিরপুরে জাহাজঘাটার কাছে থাকতাম তো। ওখানে এই প্রমেহ্ রোগের বাড়বাড়ন্ত খুব। বলে, মাসিক শুরু হয়নি এমন মেয়ের সঙ্গে শুলে নাকি ও রোগ সেরে যায়।

অন্য তিনজন চোখ কপালে তুলে বলল, মরণদশা। ঝাঁটা মারি।

মাসখানেকের মধ্যে সাপের বাচ্চাগুলো ফুলকির চোখের সামনেই বেশ বড় হয়ে গেল। জবাপিসিদের বাগানে খুব বেশি হলে দশমিনিট খোঁজাখুঁজি করলেই তাদের একটাকে না একটাকে দেখতে পায় ফুলকি। ইটের পাঁজার আড়াল থেকে, নাহয় বাঁশপাতার নীচ থেকে তারা জুলজুলে চোখ মেলে ফুলকির দিকে তাকিয়ে থাকে। সড়াৎ সড়াৎ করে চেরা জিভ মুখের মধ্যে ঢোকায় আর বার করে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, জবাপিসির হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পিসের পুজোর ঘরে একটাও ঢুকল না। ছানাগুলো পিঁপড়ে ছেড়ে ব্যাং খাবার মতন বড় হয়ে গেল।

একদিন, তখন ফুলকির স্কুলে গরমের ছুটি, পিসি তাকে ডেকে বলল, ফুলকি, তোর চান হয়ে গেছে?

ফুলকি বলল, হ্যাঁ।

তাহলে টগরগাছ থেকে ক'টা ফুল তুলে তোর পিসেমশাইয়ের ঠাকুরের আসনে সাজিয়ে দিয়ে আয় তো।

এসব মেয়েলি কাজ ফুলকির খুব একটা পছন্দ নয়, তবু জবাপিসির কথা ফেলতে পারে না। সে টিউবওয়েলের জলে হাত ধুয়ে ফুল তোলে। তারপর ফুলের সাজি নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকে। পিসে আসনে বসে চন্দনপিড়িতে চন্দন ঘষছিল। চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, কী রে ফুলকি, তুই যে ফুল নিয়ে এলি?

ফুলকি বলল, পিসি বলল।

প্রদীপপিসে বললেন, ও, তোর পিসির বুঝি শরীর খারাপ? তারপর কিছুক্ষণ কেমন একভাবে ফুলকির দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, তোর শরীর খারাপ হয়নি তো?

ফুলকি নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার তাগিদে তাড়াতাড়ি বলে উঠল,

না, না। আমার এখনো হয় না।

বেশ। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। ওঁ তদবিষ্ণো পরমন্তপ সদা পশ্যন্তি সূরয়ম...আয় ফুলকি, এইখানে আমার পাশটাতে বোস।

দরজার বাইরে থেকে জবাপিসি খর-গলায় ডাক দেয়—ফুলকি। এক্ষুনি উঠে আয়।

সেদিন সকাল থেকে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল। রাস্তাগুলো হয়ে গিয়েছিল নদী। ফুলকি যে ফুলকি, জঙ্গলচড়ুনি মেয়ে, তারও বাইরে বেরোতে মন সরছিল না। কিন্তু আবার না বেরোলেও নয়। সবেমাত্র দুদিন আগেই সে দেখে এসেছে, প্রদীপপিসের বাড়ির পেছনের ডোবার পাড়ে, হোগলাঝোপের মধ্যে ডাহুকপাখি ডিম পেড়েছে। নীল মার্বেলের মতন চারটে ডিম।

ওদিকে আবার গোখরোর বাচ্চাগুলোও সারাদিন খাই খাই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত বাগানে বেজি থাকে, তক্ষক থাকে। তারা সাপ মেরে খায়। সন্ধেবেলায় ভুতুম-পেঁচা এসে বসে গাছের ডালে। নিস্তব্ধ দুপুরে সাপমার চিল ঝোপেঝাড়ে মুখ ঢুকিয়ে সাপ খোঁজে। দত্তবাড়ির বাগানে কিছুই নেই। তাই বাচ্চাগুলোর খুব বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। ডাহুকের ডিমগুলো সাপের পেটে গেল কিনা, সেটা না দেখে স্বস্তি পাচ্ছিল না ফুলকি।

দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা একটু সময়ের জন্যে বন্ধ হতেই তাই সে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল। চলে গেল সোজা দত্তদের বাগানে।

প্রদীপপিসে এই বর্ষার শুরুতে মাঝে মাঝেই বাড়িতে থাকেন না। বাবার কাছে ফুলকি শুনেছে পাটের আড়তদারেরা এই সময়ে নদিয়ার রানাঘাটের দিকে চাষিদের কাছে পাটের দাদন দিতে চলে যায়। আজকেও পিসে বাড়িতে নেই।

সেটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। ইদানিং জবাপিসি সব বিষয়েই ভীষণ উদাসীন থাকলেও প্রদীপপিসের হয়েছে ঠিক উলটো। তিনি বাড়িতে থাকলে ফুলকির পক্ষে বাগানে ঢোকাই হয়ে যায় দায়। পিসে যেন ফুলকির গায়ের গন্ধ পান। ঠিক কোত্থেকে এসে গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে দাঁড়াবেন।

ফিসফিস করে ভালো ভালো কথা বলবেন। ফুলকির ভালোও লাগে, আবার কেমন যেন অস্বস্তিও লাগে পিসে কাছে এসে দাঁড়ালে।

সেদিন ফুলকি ডোবার পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য। জল থইথই ডোবার পাড়ে মা ডাহুকের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারটে খুদে খুদে বাচ্চা। চারিদিকের অঢেল পোকামাকড় গিলে তারা যেন মাঝের এই একদিনেই বেশ বড় হয়ে গেছে। ফুলকির ভীষণ ইচ্ছে হল একবার জবাপিসিকে দৃশ্যটা দেখায়। সে সাবধানে জবাপিসির ঘরের বাগানমুখী জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, জানলাটা বন্ধ। এইসময়ে জানলা বন্ধ কেন? পিসি কি ঘুমোচ্ছে?

মাটিতে পড়ে থাকা একটা তালের গুঁড়ির ওপরে উঠে ফুলকি ছিটকিনির ফুটোয় চোখ লাগিয়েই জমে পাথর হয়ে গেল। বিছানার ওপরে পিসি আর একটা লোক জড়ামড়ি করে ঘুমোচ্ছে। কারুর গায়ে একটা সুতো অবধি নেই।

ফুলকির নাককান দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল। গলার মধ্যে ঘুড়ির মাঞ্জার মতন খরখরে আর চটচটে একটা কিছু ডেলা পাকিয়ে উঠছিল। সে কতক্ষণ যে ওইভাবে দাঁড়িয়েছিল তা সে নিজেই জানে না।

সেদিন কখন যে ফুলকি তার বিছানায় এসে লক্ষ্মীমেয়ের মতন শুয়ে পড়েছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। তবে বিকেলের দিকে তার মা মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখল, বেশ জ্বর। জ্বরের ঘোরেই ফুলকি শুনতে পেল দত্তদের বাগানে একটা লোককে সাপে কেটেছে। লোকটা নাকি এ গ্রামের লোকই নয়। জবাপিসির বাপের বাড়ির দিকে তার বাড়ি। মাঝে মাঝে চাকরির খোঁজে প্রদীপপিসের কাছে তদ্বির করতে আসত।

শুনল, লোকটাকে না কামড়ালে সাপটা প্রদীপপিসেকেই কামড়াত। কারণ, লোকটা যেখানে মরে পড়েছিল, প্রদীপপিসে বাগানের সেই অন্ধকার রাস্তা ধরেই বাড়ি ফিরছিলেন। পড়ে থাকা লোকটার গায়ে হোঁচট খেয়ে তিনিই নাকি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করেন।

সবাই বলাবলি করছিল, প্রদীপ খুব জোর বেঁচে গেছে। ওই জবার গ্রামের লোকটা নিজে মরে প্রদীপকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। ফুলকি তাই শুনে লুকিয়ে লুকিয়ে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

তিনদিন বাদে জ্বর সারার পর ফুলকি শুনল প্রদীপপিসে সাপের হাত

থেকে বাঁচবার জন্যে একটা ময়ূর কিনেছেন। আর যায় কোথায়? মা পেছন থেকে ডাক দিয়ে তাকে আটকাবার অনেকরকম চেষ্টা করল, কিন্তু ফুলকি কারুর কথা শুনলে তো? সে তক্ষুনি ছুটল দত্তদের বাগানে ময়ূর দেখতে।

ফুলকি দেখল, তিনদিনেই বাগানের চেহারা অনেক বদলে গেছে। প্রদীপপিসে বাড়ি ফিরে সব বদলিয়ে দিয়েছেন। ঝোপঝাড় সব সাফ। বাগান ঘিরে নতুন বাঁশের বেড়া আর একদিকে ময়ূরের জন্যে খড়ের চালাঘর। পুরোনো ইটের পাঁজার চিহ্নও কোথাও নেই।

তবে সে তো শুধু বাগানটুকু। তার বাইরে বাকি গ্রামটা একইরকম রয়েছে। সেই ঘন বাঁশঝাড়। জমে থাকা শুকনো পাতার স্তূপ। ফুলকি ওখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল ডোবার পূবদিক থেকে কেঁয়াও কেঁয়াও করে একটা কোলাব্যাঙের করুণ ডাক। জঙ্গলচরা মেয়ে ফুলকি জানে, বেচারা ব্যাঙটা সাপের মুখে ধরা পড়েছে। যতক্ষণ ধরে সাপটা ওকে গিলবে, ততক্ষণই ব্যাঙটা ওইভাবে ডেকে যাবে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ডাকে চমকে উঠে ফুলকি দেখল কুন্দফুলের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রদীপপিসের নতুন ময়ূর। ময়ূরটা একবার মাত্র গলা তুলে ফুলকিকে দেখল, তারপর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে গেল যেদিকে মাটির গামলায় জল রাখা আছে, সেইদিকে।

ফুলকির কিন্তু ময়ূরের দিক থেকে আর চোখ সরে না। কী সুন্দর... কী সুন্দর ওই পাখি! পাখি বলে মনেই হয় না, মনে হয় রূপকথার কোনো জীব। অভ্র, জরি, রাংতা—পৃথিবীর যত কিছু ভালো ভালো জিনিস দিয়ে যেন ভগবান সেই ময়ূরকে গড়েছেন। কী গর্বিত তার চলাফেরার ভঙ্গি, ঘাড় তুলে তাকানো! কী ভয়ঙ্কর সুন্দর তার ডাক। তার গলার নীলে যেন মেঘের নীল এসে মিশেছে। তার চোখের নীচে সাদা কাজলের টান যেন কথাকলি নর্তকের মতন রহস্যে ভরা। হলুদ ঠোঁটে দুনিয়ার অবজ্ঞা।

দিন পনেরোর মধ্যে গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরা ময়ূর সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। শুধু ফুলকির ঘোর আর কাটে না। সে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটুর ওপরে থুতনি রেখে ময়ূর দেখে।

কখনো কখনো জবাপিসিও বাগানে আসে। জবাপিসিকে দেখলে আজকাল বড় ভয় করে ফুলকির। চোখ দিয়ে সারাক্ষণ যেন আগুন ছুটছে। চোখের তলায় কালি। গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। জবাপিসি আজকাল আঁচল দিয়ে সারাক্ষণ বুক কোমর ভালো করে ঢেকেঢুকে ঘোরে। কারণটা ফুলকি জানে। প্রদীপপিসে জবাপিসিকে আজকাল খুব পেটায়। বাগানে বসেই ফুলকি শুনতে পায় প্রদীপপিসের গালাগাল। সব কথার অর্থ বুঝতে পারে না। হারামজাদি যেমন চেনা শব্দ, কিন্তু খানকি মাগি মানে কী? আর গালাগালের সঙ্গেই শুরু হয় মার। একটা কথা ফুলকি স্বীকার করে। জবাপিসি যেরকম মুখে টুঁ শব্দ না করে মার খেতে পারে, তেমনটা কোনো হালের বলদও পারে না।

জবাপিসিকে মার খেতে দেখলে খুব একটা দুঃখ হয় না ফুলকির। তার মাথার মধ্যে বারবার ফিরে আসে সেই দুপুরের ল্যাংটো ছবিটা। দাঁতে দাঁত চিপে ফুলকি আস্তে আস্তে বলে—মার খাওয়াই উচিত খানকি মাগির। মানে না জানলেও গালাগালটা বেশ জুতসই লাগে ফুলকির।

জবাপিসি বাগানে এলে ফুলকি অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কেউ কারুর দিকে তাকায় না। দুজনেই ময়ূর দেখে। ময়ূর প্রথম প্রথম ওদের কাউকেই দেখত না, নিজের মনে মাটি ঠুকরে বেড়াত। তারপর কিছুদিন সে দুজনকেই দেখত। কী তীব্র সেই চাউনি। যেন বুকের ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছে। এক পা, দু-পা করে কাছে এগিয়ে এসে,পা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে দৃষ্টিকে ওপরদিকে তুলত। ফুলকি স্কার্ট দিয়ে নিজের হাঁটু ঢাকতে ঢাকতে আড়চোখে চেয়ে দেখত, জবাপিসিও আঁচল দিয়ে বুক ঢাকছে।

ময়ূরটা প্রবলভাবে পুরুষ। এবং এমন পুরুষ যার পাশে নারী নেই...ময়ূরী নেই।

তারপর সেই দিনটা এল। সেটাও ছিল দুপুরবেলা। সেদিনও মেঘ করেছিল খুব। ময়ূরটা তার কিছুক্ষণ আগেই একটা সাপ মেরেছিল। সেটাকে কিছুটা খেয়ে, কিছুটা ছড়িয়ে, ফিরে এল সেই নারকেল গুঁড়িটার কাছে, যেখানে ফুলকি বসেছিল।

ফুলকির একদম কাছে এসে দাঁড়াল ময়ূরটা। গলা বাড়িয়ে দিল ফুলকির দিকে। এই প্রথম ময়ূরটার মসৃণ নরম পেশী দিয়ে গড়া নলের মতন গলায় হাত বুলিয়ে দিল ফুলকি। এরকম কোনো অঙ্গে এর আগে হাত দেয়নি ফুলকি। তার গাটা শিরশির করে উঠল। ময়ূরটা একপা দু-পা করে একটু পিছিয়ে গেল, কিন্তু একবারের জন্যেও ফুলকির চোখ থেকে চোখ সরাল না।

ফুলকি চোখের কোনা দিয়ে দেখল, তাদের উলটোদিকে, কিছুটা দূরে, জবাপিসি এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর মেঘ ডেকে উঠল। এমন আশ্চর্য মেঘের ডাক আগে কখনো শোনেনি ফুলকি। মেঘ ডাকল যেন তার বুকের অনেক ভেতরে। যেন ফুলকির অনেকজন্ম আগেকার চাপা পড়ে থাকা সব কষ্ট সেই মেঘগর্জনের সঙ্গে ওপরে ভেসে উঠল আর সেই গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ময়ূরটা আকাশের দিকে মুখ তুলে তীব্র আশ্লেষে ডেকে উঠল—ক্রেয়াও ক্রেয়াও ক্রেয়াও।

তারপর শুরু হল তার নাচ। ঝলমলে পেখম মেলে, ঘুরে ফিরে সে কী আনন্দে উদ্বেল নাচ তার। ময়ূর নাচ দেখাচ্ছে ফুলকিকে। ময়ূরটা ফুলকিকে নাচ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। ফুলকির মনের মধ্যে কি যে হচ্ছিল তা সে বোঝাতে পারবে না। যেন পৃথিবীর শেষ রাজা তার মনোরঞ্জনের জন্যে তার সামনে নতজানু হয়ে ভিক্ষা করছেন। ফুলকির বুকের ভেতরে মুহুর্মুহু বিশাল সব উল্কা খসে পড়ছিল, আবার সেই সব উল্কার আঘাতে তৈরি সাগরপ্রমাণ গহ্বর মুহূর্তের মধ্যে ভরে উঠছিল প্লাবনের জলে।

মেঘের ডাকে কোনো যতি ছিল না, যতি ছিল না বৃষ্টির। যতি ছিল না সেই ময়ূরের প্রণয় নৃত্যে। বৃষ্টির জল ফুলকির গাল গলা মুখ ভাসিয়ে দিয়ে, হু-হু করে নেমে যাচ্ছিল তার সদ্য প্রস্ফুটিত দুই স্তনের মাঝখান দিয়ে আরো নীচে। হঠাৎ...হঠাৎই একটা বড়সড় ঢিল উড়ে এল ময়ূরটার দিকে। ময়ূরটার গায়ে না লাগলেও সে নাচ থামিয়ে গম্ভীরভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল নারকোলগাছের সারির ওইদিকে। ফুলকি দেখল, জবাপিসির চোখ থেকে আগুন ঝরছে।

তারপর থেকে ময়ূরটাকে নিয়ে হল ফুলকির জ্বালা। সে যখন-তখন ফুলকির ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে ডাক দেয়। বলে, ফুলকি! একবার বাইরে এসো। দেখো, চারিদিকে কেমন আমন মরশুম। খেতে-খেতে ফনফন করে বেড়ে উঠছে কোটি কোটি ধানগাছ। কত সঙ্গম ঘটছে চারিদিকে, কত জন্ম। বৃষ্টিথামা বিকেলবেলায় আকন্দঝোপের মাথায় হাজার হাজার লাল ফড়িং-এর ওড়াউড়ি। ধানের খেতে জমে থাকা জলের বুকে বিদ্যুতের মতন দৌড়াদৌড়ি করছে তেচোখো মাছের ঝাঁক। গাংশালিখ আর শামুকখোল পাখিরা কেঁচো আর শামুক খেয়ে ফুরোতে না পেরে ভোম্বলের মতন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এত মজা চারিদিকে, তুমি কিছুই দেখবে না?

ফুলকি ফিসফিস করে বলে, বোঝো না কেন ময়ূর? আমি কি আর ছোট আছি? বড় মেয়ে হয়ে গেছি না? মা আমাকে আর যখন-তখন বেরোতে দেয় না। তুমি এভাবে এসো না ময়ূর। এভাবে আমাকে লোভ দেখিও না।

মাঝরাতে ফুলকির মা ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে। ফুলকি বলে, কী হল মা?

ময়ূরটা এত রাতে কেমন কান্নার মতন আওয়াজ করে ডাকছে শোন। বুক হিম হয়ে যায়। কি অলক্ষুণে পাখিরে বাবা! মরেও না।

ফুলকি মায়ের মুখে হাত চাপা দেয়। তারপর সে-ও কান পেতে শোনে ময়ূরের কান্না। শুনতে শুনতে তার গাল বেয়ে দুটো জলের ধারা গড়িয়ে নামে। মা অন্ধকারে সেই কান্না দেখতে পায় না।

পরদিন ফুলকি লুকিয়ে লুকিয়ে দত্তদের বাগানের বেড়ার সুপুরিগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ময়ূরটা পেখম নামিয়ে ডানার মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। হঠাৎ ফুলকির গায়ের গন্ধে চনমন করে পাখা ঝাপটে মাটিতে নেমে আসে। এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক খুঁজে বার করে ফুলকিকে। বেড়ার মধ্যে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। ফুলকি ঝুঁকে পড়ে ময়ূরের গলায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ভালোবাসো আমাকে? সেই প্রশ্নের উত্তরে ময়ূরের পেখম সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তার চোখের মণিদুটো চুনির টুকরোর মতন লাল হয়ে ওঠে। ময়ূর তার বুনোকুল-খাওয়া পারঙ্গম দুই

ঠোঁট দিয়ে আলতো করে কামড়ে ধরে ফুলকির স্তনবৃন্ত। ফুলকি চারিদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বাগানে ঢোকে। তারপর ময়ূরের সঙ্গে হারিয়ে যায় কুন্দফুলের ঝোপের আড়ালে।

প্রদীপ দত্ত মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে ফুলকিরও সিফিলিস ধরা পড়ে।
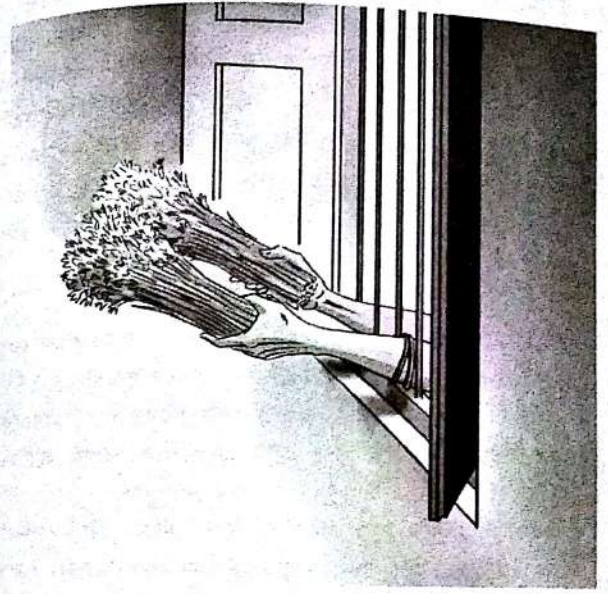
মড়া ফুলের মধু

কপালটাই শালা খারাপ। এমন একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়ল যাকে রিফিউজ করলাম ঠিকই, কিন্তু তার পরেও কাউকে 'কলার' তুলে সে-কথা বলতে পারলাম না। সে-কথা কোনো অবস্থাতেই কাউকে বলার মতন নয়। শুনলে বন্ধুবান্ধব হ্যাটা করত। বলত, ওই মালটাকে রিফিউজ করার আগেও দুবার ভেবেছিলিস নাকি? তুই তো তাহলে পারভার্ট, বিকৃতকাম।

সত্যি মাইরি, এরকম মেয়ে আগে দেখিনি। মোমবাতির মতন চেহারা। রোগা, ঢ্যাঙা। বুক পাছা কিচ্ছু নেই। একেবারে নিমাই। গায়ের রংটাও মোমবাতির মতন ফ্যাকাশে। একদিন কথায় কথায় বলেছিল, জটিল কোনো

স্ত্রীরোগ আছে। প্রচুর ব্লিডিং হয়। শুনে শালা গা গুলিয়ে উঠেছিল।

মেয়েটার নাম সুমনা। বাসস্টপে আমাকে দেখেই বোধহয় প্রেমে পড়েছিল। আমি কিন্তু ওকে আগে কখনো খেয়াল করিনি। একদিন ও সোজা আমাদের বাড়িতেই চলে এসেছিল। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা, গায়ে ল্যাপটানো রং-ওঠা সুতির শাড়ি। ঘামে ভেজা মুখ। প্রথমে ভেবেছিলাম ধূপকাঠি কিম্বা আচার বিক্রি করতে এসেছে বোধহয়। বলেছিলাম, একটু দাঁড়ান। মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুখ নীচু করে বলল, আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অবাক হয়ে বললাম, আমার কাছে? বলুন।

আমার নাম সুমনা দাস। আমাকে তুমিই বলবেন। কয়েকটা কাগজ একটু অ্যাটেস্ট করে দেবেন? আমি আপনার বাড়ির পেছনে সুকান্তনগরে থাকি।

সুকান্তনগর জায়গাটা আসলে বস্তি। খোলার চালের ঘরে গরিবগুর্বো মানুষজন থাকে। মেয়েটাকে দিব্যি মানায় ওখানে। এর কাগজ অ্যাটেস্ট করে দেওয়া ঠিক হবে? জাল-ফাল বেরোবে না তো?

মেয়েটার চোখদুটো কিন্তু অন্যরকম। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, দিয়ে যাও। কাল অফিস থেকে করে এনে রাখব। এইরকম সময়ে এসে নিয়ে যেও।

সুমনা বিনীত হেসে বলল, কী বলে যে আপনাকে...। আসলে পরশুই একটা চাকরির ইনটারভিউ রয়েছে। আপনি না করে দিলে বিপদে পড়তাম।

পরদিন যখন সুমনা কাগজগুলো ফেরত নিতে এল তখন হাতে করে নিয়ে এল পাঁচটা রক্তগোলাপ। একদম ফ্রেশ। আমার হাতে গোলাপগুলো তুলে দিল।

আমি বললাম, একী!

লাজুক হেসে বলল, নিন না। আপনার জন্যেই এনেছি।

ভদ্রতা করে বললাম, তোমার গাছের ফুল বুঝি? বাঃ, খুব সুন্দর। আমি ফুল খুব ভালোবাসি। গোলাপগুলো নাকের কাছে নিয়ে একটু গন্ধও শুঁকলাম। সুমনার মুখটা খুশিতে ভরে উঠল।

ওই ভালোমানুষি করতে গিয়েই ফেঁসে গেলাম। মেয়েটা বোধহয় ভুল

বুঝল। তারপর থেকে প্রায়ই এই ফুল, ওই ফুল নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে যেত। কখনো কয়েকটা চাঁপা। কখনো গন্ধরাজ। কখনো একমুঠো বেল। দেখলেই বোঝা যায় দোকান থেকে কেনা নয়, গাছ থেকে টাটকা তোলা ফুল।

ছেলেদের এসব ব্যাপার বুঝতে একটু সময় লাগে। মেয়েদের চোখে চট করে ধরা পড়ে। আমার বোন টুম্পা একদিন মুচকি হেসে বলল, যাগগে দাদামণি, তোর মতন অকালকুষ্মাণ্ডেরও একটা হিল্লে হয়ে গেল।

বললাম, মানে?

সুন্দরী সুমনা তোর প্রেমে পড়েছে। মা-বাবাকে তাহলে বলি, একদিন সুকান্তনগরে গিয়ে কথাবার্তা পাকা করে আসতে?

টুম্পাকে গাঁট্টা মেরে তাড়ালাম ঠিকই, কিন্তু ওর কথা শুনে আমার মাথায় নিঃশব্দে বাজ পড়ল। ভেবে দেখলাম, তাই তো। অ্যানিমিক মেয়েটারও তো আমার সামনে এসে দাঁড়ালে গালে রক্ত ফোটে। কালি পড়া চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। মেয়েটাকে প্রথম স্টেজেই কড়া ট্যাকল করতে হবে। নাহলে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কেস আরো জন্ডিস হয়ে যাবে।

পরেরদিন সুমনা কয়েকটা রক্তকরবী নিয়ে এসে আমার হাতে দেওয়ামাত্র আমি জিগ্যেস করলাম, এইসব ফুল কোথা থেকে নিয়ে আসো সুমনা? তোমার বাগানের ফুল?

সুমনা আহত গলায় বলল, দশফুট বাই আটফুটের ভাড়া ঘরে বাবা-মা, ভাইবোন মিলে পাঁচজন মানুষ কুকুর-কুন্ডুলি করে বাস করি। বাগান কোথায় পাব?

তাহলে?

লোকের বাগান থেকে তুলে আনি। এই আপনাদের মতন বড়লোকদের বাগান থেকেই।

আমি যথাসাধ্য তেরিয়া গলায় বললাম—ছি ছি ছি! চুরি করা ফুল তুমি দিনের পর দিন আমাকে দিয়ে যাচ্ছ! কেন? কী দরকার? এইভাবে তো তুমি আমাকে চোরাইমালের খরিদ্দার বানাচ্ছ।

খরিদ্দার? সুমনার চোখে তখন রাজ্যের বিস্ময়। বলল, আমি আপনাকে ফুল বিক্রি করি না তো।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, নিজের কিছু থাকলে দিয়ে যেও, রেখে দেব। এইভাবে চুরি করা ফুল দিও না। আর শোনো। তুমি যা ভাবছ তা হবে না। ফুল ছাড়াও একজন মেয়ের আরো অনেক কিছু দেওয়ার থাকে। তোমার সে সব কিছুই নেই।

সুমনা মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

বুকের ভেতর একটা আলপিনের খোঁচা টের পেলাম। কিন্তু ওসব কিছু নয়। বাংলা কথা যে বাংলা করেই বলে দিতে পেরেছি এটাতেই তখনকার মতন স্বস্তি পেলাম। দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সুমনাকে ফিরিয়ে দিয়ে কী ভালো যে করেছি, সেটা বুঝলাম পরেরদিন সুবোধবাবুর কথা শুনে। ভদ্রলোক আমাদের কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকেন। খচাই বুড়ো বলতে যা বোঝায় একেবারে সেই জিনিস। সকালে ময়লাওলা থেকে শুরু করে রাতের নাইটগার্ড অবধি সকলের পেছনে টিক টিক করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। দুনিয়ার লোকের খুঁত খুঁজে বার করে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে যান। এটাই ওনার দু-নম্বর হবি। এক নম্বর হবি বাগান করা। এবং বলতে দ্বিধা নেই, সেটাও খুব ভালো করেন।

শীতকালে যখন ওনার বাগান ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আর ইনকায় আলো হয়ে থাকে তখন অনেকসময় সামনে দিয়ে যেতে যেতে ভাবি, তাহলে শয়তানের হাত দিয়েও ঈশ্বরীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতে পারে! কী আশ্চর্য!

সেই সুবোধবাবুই সেদিন রাস্তায় আমার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

বললাম, কী হল?

উনি বললেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বদমাশ মেয়েছেলেটাকে যেভাবে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলে, ভেবেছিলুম বাগানের ফুলগুলো আর একটাও থাকবে না।

অবাক হয়ে বললাম, কী বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন তো।

উনি ফাজিলের মতন হেসে বললেন, ছেলের বয়সি ছেলের সামনে সব কি আর পরিষ্কার করে বলা যায়? এইটুকু শুধু বলি, তোমার পুজোর ফুলের জোগান দিতে গিয়ে আমার রক্ত জল করা বাগানটা তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। ভোর নেই, রাত নেই, ওই পেত্নীর মতন মেয়েছেলেটা আমার বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তোমাকে দিয়ে আসত। কতবার তাড়া করেছি। ধরতে পারিনি। পারলে ঘেঁটি ধরে তোমার সামনে নিয়ে যেতাম। যাই হোক। গত কদিন সেই আপদটাকে আর দেখছি না। ভালো করে ঝাড় দিয়েছ, তাই না? ঠিকই করেছ। তোমাদের কত বড় বংশ। কত বড় চাকরি করো তুমি। ওই বস্তির মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করা কী তোমাকে মানায়?

আমার মুখে কথা সরার আগেই সুবোধবাবু পাড়ার কাউন্সিলর খেতুদাকে তাড়া করে অন্যদিকে চলে গেলেন। বোধহয় কলের জল কেন এত সরু পড়ছে তাই নিয়ে দু-কথা শোনাবেন। আমি অধোবদন হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভাবলাম, এই একটা বার অন্তত খচাই বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। পেডিগ্রির তফাতটা অস্বীকার করা যায় না। একটা দামড়া, কলেজে-পড়া মেয়ে লোকের বাগান থেকে ফুল চুরি করত কেমন করে?

তার ঠিক দুদিন বাদে ভোরবেলায় উঠে মশারির দড়ি খুলছি। আমার একতলার ঘরের রাস্তার দিকের জানলার কাছ থেকে মেয়েদের গলায় ডাক ভেসে এল—শুনছেন?

তাকিয়ে দেখি জানলার সামনে সুমনা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রচণ্ড বিরক্ত হলাম। বললাম, কী ব্যাপার? মানুষের প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে জানো না? এইভাবে জানলা দিয়ে উঁকি মারছ কেন?

এইগুলো আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। নিয়ে নিন। আমি চলে যাচ্ছি। সুমনা ডানহাতটা উঁচু করে দেখাল। ওর হাতে টাটকা রজনীগন্ধার দুটো মোটা তোড়া।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠলাম, গেট আউট। গেট আউট আই সে। লজ্জা করে না? চুরি করা ফুল দিতে এসেছ? কার বাগান থেকে চুরি করে আনলে? সুবোধবাবুর বাগান থেকে? তুমি জানো, উনি আমাকে

দুদিন আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী অপমানটা করেছেন। ফুল দিচ্ছ, ফুল? ফুল দিয়ে মন পাবে?

সুমনা নির্লজ্জের মতন হেসে বলল, ফুল দিয়ে মন পাব কেন? মন দিয়েছি বলে ফুল দিচ্ছি। ভয় নেই এগুলো আমার নিজের ফুল। তুমি নাও।

এই প্রথম ও আমাকে তুমি বলে কথা বলল। এই প্রথম ও ভোরের আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে ভালোবাসে। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা কেমন আনচান করে উঠল। তার পরেই সেই সাময়িক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে নীচু গলায় বললাম, নিজের ফুল? কিনেছ নাকি?

না, কিনিনি।

তাহলে? বাগান করেছ? ক'কাঠার বাগান কিনলে? নাকি, বস্তির কোনো প্রেমিক দিয়েছে?

সুমনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মনে হল কান্না চাপার চেষ্টা করছে। তারপর ধরা গলায় ফিসফিস করে বলল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারব না। এখানে রেখে গেলাম। তুমি ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখো কিম্বা ডাস্টবিনে ফেলে দিও—যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু একটা কথা সত্যি বলছি, এগুলো আমার নিজের ফুল। একদম আমার নিজের।

সুমনা চলে গেল। আমি জানলার সামনে থেকে রজনীগন্ধার তোড়া দুটোকে তুলে এনে রান্নাঘরের ডাস্টবিনের পাশে রেখে এলাম। বাড়ির কাজের লোক ময়লাওলার ভ্যানে তুলে দেবে। তারপর তাড়াহুড়ো করে বাজারে বেরোলাম। দুধ আর রুটিটা সকালেই না নিয়ে এলে মা আমাকে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিতে পারে না। তাই এই কাজটা আমাকে রোজই করতে হয়।

সুকান্তনগরের মধ্যে দিয়েই বাজারের দিকে যেতে হয়। যেতে যেতেই একটা খোলার ঘরের সামনে দেখলাম বস্তির লোকেদের ভিড়। ভিড় কাটিয়ে যেতে গিয়ে পা দুটো জমে পাথর হয়ে গেল। মাথাটাও কেমন যেন ঘুরে গেল। একটু সামলে নিয়ে আবার তাকালাম ভিড়ের মাঝখানে নামিয়ে রাখা খাটিয়াটার দিকে।

না, কোনো ভুল নেই। যে মৃতদেহটা খাটিয়ার ওপরে শোয়ানো রয়েছে সেটা সুমনার। সেই মোমবাতির মতন সাদা মুখ, চুল উঠে যাওয়া চওড়া কপাল। বড়জোর পনেরো মিনিট আগেই ওই মুখ আমি আমার ঘরের জানলায় দেখেছি।

না, এটা হতে পারে না। কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। সুমনার যমজ বোন ছিল কি? ছিল নিশ্চয়। ব্যাপারটা না বুঝে চলে যাওয়া যায় না। ভিড়ের মধ্যে একজন চেনা লোককে দেখতে পেলাম। রিকশা চালায়। বিশু না বিধু কী যেন নাম। ওকেই জিগ্যেস করলাম, কী হল ভাই?

আর বলেন কেন দাদা? আমাদের নিরঞ্জনদার মেয়ে। বাজারে সবজি বেচে যে নিরঞ্জনদা, চেনেন তো?

শুকনোমুখে ঘাড় নাড়লাম।

এই অবস্থায় থেকেও কলেজ পাশ করেছিল। চাকরি খুঁজছিল। তারপর কী যে হল, কাল সন্ধেবেলায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে...।

ভিড়ের অন্যদিক থেকে কে একজন চ্যাঁচাল—তোরা আর কত দেরি করবি রে জগা? শালা, কাল রাত থেকে গর্দিশ চলছে। থানা, পোস্টমর্টেম সব একা হাতে সামলালাম। এখন তোরা যদি খাটিয়াটাও না তুলতে পারিস তাহলে আর কী বলব?

উত্তরে এদিক থেকে আরেকজন বিরক্ত গলায় বলল, দাঁড়াও না দেবুদা। দেখছ তো আমাদের বস্তিটা কেমন ছ্যাঁচড়ার রাজত্ব হয়েছে। মড়ার খাটিয়ায় বাঁধার জন্যে দু-বান্ডিল রজনীগন্ধা এনে পেছনের রোয়াকে রেখেছিলাম—তাও শালা কে ঝেপে দিল। আবার কিনতে পাঠিয়েছি। এলেই রওনা দিয়ে দেব।

সাদা চাদর দিয়ে মোড়া রোগা শরীর আর মোমবাতির মতন নীরক্ত মুখটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখলাম। নাঃ, সুমনাই। কোনো ভুল নেই। ঠোঁটের কোনায় ওই যে কান্নার মতন সামান্য হাসি লেগে আছে ওটা পনেরো মিনিট আগেও ছিল। সত্যিই আজ ও ফুল চুরি করেনি। বলেছিল না, এ আমার নিজের ফুল? একশিশি ঘুমের ওষুধের দামে কেনা দুটো ফুলের তোড়াই ভোর-ভোর আমাকে দিয়ে এসেছে।

বাজার যাওয়া হল না। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আবার বাড়ির

দিকেই পা চালালাম। এখনো নিশ্চয়ই ময়লাওলার গাড়ি আসেনি, রজনীগন্ধার জোড়াদুটো নিশ্চয় রান্নাঘরের কোণেই পড়ে আছে।

প্রার্থনা করছিলাম, যেন থাকে।

দুটো ফুলদানি কি আর খুঁজলে পাব না?
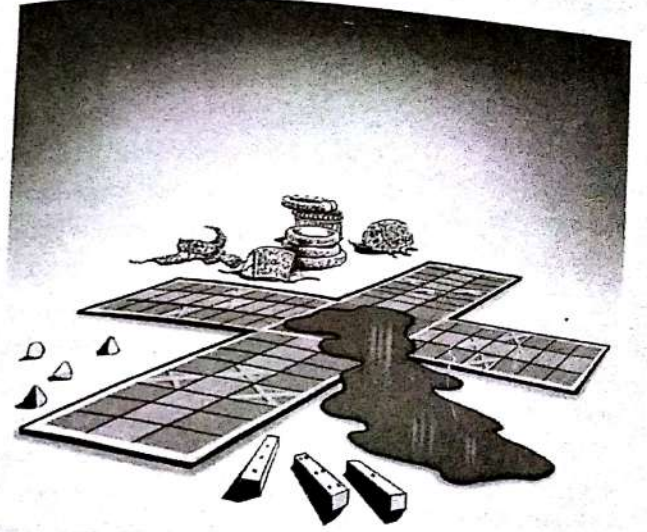
পাশা

অপূর্ব ব্যানার্জির বয়স বত্রিশ। সে অবিবাহিত, কিন্তু তার প্রথম রিপুটি অবদমিত নয়। উত্তর কলকাতার বাসিন্দা অপূর্বকে কাজের খাতিরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় তো বটেই, ভারতের নানান শহরেও দৌড়ে বেড়াতে হয়। এর মাঝে যখনই সে বিশ্রাম করে তখনই তার সঙ্গে সঙ্গিনী থাকে।

অপূর্বর জীবিকা-টাও বেশ অপূর্ব। সে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন নাম করা 'প্রপ-সাপ্লায়ার'। সিনেমার শ্যুটিং-এর সময় সেটটাকে পরিচালকের মনের মতন করে সাজানোর জন্যে হাজার রকমের জিনিসের দরকার পড়ে। সেগুলোকেই বলে 'প্রপ'। আর পয়সার বিনিময়ে পরিচালকদের হাতে

সেগুলোকে তুলে দেওয়াই হল 'প্রপ-সাপ্লায়ারের' কাজ।

অবশ্য একটা সাধারণ সিলিং-ফ্যান কিম্বা ঝুলঝাড়ুর দরকার পড়লে কেউ অপূর্ব ব্যানার্জির কাছে আসে না। কিন্তু যখন একটা অরিজিনাল রবি বর্মার পেইন্টিং কিম্বা উনিশশো ছত্রিশ সালের মোটরগাড়ির দরকার পড়ে তখন বলিউড আর টলিউডের বহু নামজাদা সিনেমা-পরিচালকই অপূর্বর শরণাপন্ন হন। কারণ তাঁরা জানেন, তাকে দায়িত্ব দিলে সে দৌড়ঝাঁপ করে জিনিসটা ঠিক জোগাড় করে দেবে। এ ব্যাপারে ওর অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে।

তাই আজ থেকে ঠিক বাইশ দিন আগে বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক গগন দেশমুখ এই অপূর্ব ব্যানার্জিকেই ফোন করে বললেন, দ্যাখো ভাই অপূর্ব। যুধিষ্ঠিরকে হিরো করে একটা টিভি সিরিয়াল বানাচ্ছি। শকুনি আর যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার সিন থাকবে। কাজেই একটা বেশ রাজকীয় পাশা লাগবে। এক মাসের মধ্যে জিনিসটা আমার চাই।

অপূর্ব ব্যানার্জি খেপে গিয়ে বলল, এমন এমন জিনিস আনতে বলেন না গগনভাই! কোনদিন হয় তো একটা জ্যান্ত জটায়ু পাখি চেয়ে বসবেন। ওসব পাশা-টাশা নিয়ে কি এখন কেউ খেলা করে, যে জোগাড় করে দেব? তার চেয়ে আপনার আর্ট ডিরেক্টরকে বলুন না, পিজবোর্ড রাঙতা-টাঙতা দিয়ে একটা বানিয়ে দেবে।

গগন দেশমুখ একটুও না রেগে বললেন, আরে ভাই, বুঝছ না কেন? কপি করতে গেলেও তো অরিজিনাল জিনিসটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে। ওই যোগ চিহ্নের মতন দেখতে বোর্ড, চৌকোণা সব ঘুঁটি—না দেখে বানানো যায় না কি? আমি কোনো আপত্তি শুনব না। তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে। খরচার জন্যে ভেবো না। কত লাগবে বলো?

ঝোঁকের মাথায় অপূর্ব ব্যানার্জি বলে ফেলল, পঞ্চাশ হাজার। তার কমে পারব না।

ডান। পঁচিশ হাজার টাকা কালকেই তোমার অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা ডেলিভারির সময় পেয়ে যাবে। ঠিক আছে?

ঠিক না থেকে আর উপায় কী? এতগুলো টাকার মায়া তো আর ছাড়া যায় না। অতএব অপূর্ব খোঁজখবর করতে শুরু করল। কেউই কোনো খবর দিতে পারে না। শেষে গত পরশু, মুর্শিদাবাদের এক এজেন্ট ফোন করে

জানাল, ওই জেলারই প্রীতমপুর-রাজবাড়িতে একটা বহু পুরোনো পাশা খেলার ছক, ঘুঁটি-টুটি সমেত, সংরক্ষিত আছে। অগত্যা চল প্রীতমপুর।

অপূর্ব নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে চলল। বহরমপুর পৌঁছোতেই বেলা বারোটা বেজে গেল। খোঁজখবর নিয়ে দেখল বহরমপুর থেকে প্রীতমপুর আরো চল্লিশ কিলোমিটার। রাস্তার হাল জঘন্য। তার ওপরে কোথাও কোনো ইন্ডিকেশন নেই। দুবার রাস্তা হারিয়ে, ফালতু অনেক বাড়তি চক্কর কেটে, শেষমেষ যখন প্রীতমপুরে পৌঁছোল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

চারিদিকের দৃশ্য দেখে অপূর্বর মনটা দমে গেল। সারা তল্লাট জুড়ে বাঁশঝাড়, পানা-পুকুর, খেজুরগাছ। তারই মধ্যে গোটা চল্লিশেক খোড়ো চালের কুঁড়েঘর নিয়ে প্রীতমপুর গ্রাম। এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এক রাজামশাই যে কোন দুঃখে রাজবাড়ি বানাতে এসেছিলেন সেটাই অপূর্বর মাথায় ঢুকছিল না। তবে বানিয়েছিলেন যে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিশাল এক ডায়নোসরের ফসিলের মতন ভাঙাচোরা রাজবাড়িটা দু-মাইল দূরের বাস-স্ট্যান্ড থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আর দেরি না করে অপূর্ব সেদিকে পা চালাল।

যেতে যেতে অপূর্ব অবাক হয়ে দেখছিল, শুধু যে রাজবাড়িটিই ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে তাই নয়। গ্রামের সীমানার বাইরে, এখানে ওখানে, ওরকম বহু ভাঙাচোরা বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশাল দুটি দিঘিও সে পেরিয়ে এল, যেগুলোর পাড় এককালে পুরোনো আমলের ছোট ইট দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো ছিল। এখন অনেকটাই ধ্বসে পড়েছে। বড় বড় আমবাগান, তাও এখন ঝোপঝাড়ে ভর্তি। তাদের সীমানা-পাঁচিলের অনেকটাই লোপাট। পুরোনো গোরস্থান, পরিত্যক্ত বিশাল ইঁদারা—দেখলে মনে হয় পুরো জায়গাটাই যেন বহু যুগ ধরে মাটির নীচে চাপা পড়েছিল; সম্প্রতি কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক মাটি খুঁড়ে সেই বিলুপ্ত জনপদকে উদ্ধার করেছেন।

একটু আগে যে প্রশ্নটা অপূর্বর মনে জেগেছিল, সেটার উত্তর এইভাবেই সে পথ চলতে চলতে পেয়ে যাচ্ছিল। প্রীতমপুরের যে গ্রাম সে একটু আগে পেরিয়ে এল, সে গ্রামের পত্তন হয়েছে পরে। তার অনেক আগে প্রীতমপুর

এক বর্ধিষ্ণু শহর ছিল। রাজা ছিলেন সেই শহরেরই রাজা, এখনকার ওই অজ গ্রামের নয়।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আরেকটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিচ্ছিল। ঘরবাড়ির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোনোটাই দুশো বছরের বেশি পুরোনো নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে একটা জায়গা এভাবে উজাড় হয়ে গেল কেমন করে?

এই প্রশ্নের উত্তরটা পেতে তাকে রাত অবধি অপেক্ষা করতে হল। তার আগে সে রাজবাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দেখেছে সেখানে জনমানব নেই, তবে রাজবাড়ির পেছনের মাঠে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মন্দির—মুক্তকেশী কালীর মন্দির। আর সেই মন্দিরের লাগোয়া জরাজীর্ণ একতলা বাড়িটায় একজন প্রৌঢ় আর এক যুবতী বাস করছেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে জ্ঞানাতীত ভট্টাচার্য, ওই মন্দিরের পুরোহিত, আর তাঁর মেয়ে রক্তিমা।

না, ও-বাড়িতে আর কেউ থাকে না। রক্তিমার মা মাত্র ছ'মাস আগে মারা গিয়েছেন, সে কথা এ বাড়িতে ঢোকার একটু পরে জ্ঞানাতীত ভটচাজ-ই অপূর্বকে জানিয়েছিলেন।

অপূর্বকে বাধ্য হয়েই সেই রাতে জ্ঞানাতীত ভট্টাচার্যর আতিথ্য গ্রহণ করতে হল। কারণ পথে ডাকাতের ভয় আছে। অত রাতে কলকাতায় ফেরাটা ঠিক হত না। সে ঠিক করল, পরদিন সকালবেলায় ফিরবে।

পুরোহিতমশাইয়ের বাড়ির পুরোনো ইঁদারার জলটা ছিল হিম শীতল। সেই জলে স্নান করতেই পথশ্রম অর্ধেক উধাও হয়ে গেল। রক্তিমার নিজের হাতে বানানো সাদা ময়দার লুচি আর ছানার ডালনা পেটে পড়তে বাকিটাও গায়েব। তারপর বাকি থাকে কাজের কথা, এবং সেই পর্ব-টা এত সহজে মিটল যে অপূর্ব নিজেও অবাক। জ্ঞানাতীত ভট্টাচার্য অপূর্বকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মুক্তকেশীর মন্দিরে। আড়াইশো বছরের পুরনো পাথরের মন্দির। ভেতরটা স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকার। কষ্টিপাথরের তৈরি ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি। সামনে একটা বড় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। মূর্তির পায়ের কাছে এক লোহার সিন্দুকের চাবি খুলে পুরোহিতমশাই বার করে আনলেন সেই পাশার বাক্স।

বাক্সটাই আসলে খেলার ছক। চারদিক থেকে চারটে রুপোর হুক খুলে দিতেই বাক্সটা চ্যাপ্টা হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। পার্চমেন্টের মতন নরম কোনো একটা জিনিস দিয়ে ছকটা বানানো হয়েছে। প্রাচীন পুথির পুষ্পিকায় যেমন বহু বর্ণের অলংকরণ দেখা যায়, সেরকম অলঙ্করণে পুরো ছকটা সাজানো। শুধু অলংকরণের বিষয়বস্তু বড় বেশি 'ইরোটিক'। নানান আসনে আবদ্ধ নগ্ন নারীপুরুষের মিথুনদৃশ্যে পুরো পটটাই ভরে রয়েছে। এই পাশাকে অনায়াসে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ইলাস্ট্রেশন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

তবে একটা কথা ভেবে অপূর্ব একটু আশঙ্কিত হল। যুধিষ্ঠিরের মতন এক সাত্ত্বিক চরিত্রের সামনে গগন দেশমুখ এই পাশার ছক পাততে পারবে তো?

পরক্ষণেই সে মনে মনে বলল, চুলোয় যাক দেশমুখ। দেশমুখ নিতে না চাইলে সে এই অমূল্য অ্যান্টিককে বিদেশমুখ করে দেবে। সোজা বাংলায়, পাচার করে দেবে কোনো বিদেশী অ্যান্টিক সংগ্রাহকের কাছে। তাতে তার লাভ কিছু কম হবে না।

এরপর যখন জ্ঞানাতীত ভটচাজ পাশার ঘুঁটিগুলোকে তার সামনে ছড়িয়ে দিলেন তখন অপূর্ব একেবারে হতবাক হয়ে গেল। ঘিয়ে রঙের আয়তাকার ঘুঁটিগুলো নিশ্চয় হাতির দাঁতের তৈরি, আর যদিও মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্ত-শিল্পের ব্যাপারটা অপূর্বর অজানা ছিল না, তবু আইভরির ওপরে এত সূক্ষ্ম কারুকাজ যে কোনো কারিগর খোদাই করতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ যেন বালুচরি শাড়ির আঁচলের নকশা। কোনোরকমে পাশার দিক থেকে চোখ সরিয়ে অপূর্ব জ্ঞানাতীত ভটচাজের মুখের দিকে তাকাল। তিনিও পাশাটার দিকেই তাকিয়েছিলেন।

তবে তাঁর মুখের রেখায় রেখায় মুগ্ধতা নয়, ফুটে উঠেছিল ভয়। কেন, কে জানে?

অপূর্ব সরাসরি বলল, এই পাশাটা আপনি আমাকে বিক্রি করুন। তার জন্যে যা দাম চাইবেন আমি দেব।

না, না। বিক্রি নয়, বিক্রি নয়। এটা...এটা আপনি এমনিই নিয়ে যান। নিয়ে আমাকে বাঁচান।

হতবুদ্ধি অপূর্ব পুরোহিতমশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, মানে?

বলছি। আপনাকে সব কথা বলছি। আগে ঘরে চলুন। এই জিনিসটাকে বাইরে রাখতে আমার সাহস হয় না।

হঠাৎ-ই মনে হল একটা হাতের ছায়া পাশার ছকটার ওপর দিয়ে চলে গেল।

দেখলেন? দেখতে পেলেন? প্রায় চিৎকার করে উঠলেন জ্ঞানাতীত ভট্টাচার্য।

ছায়াটার কথা বলছেন? ও কিছু না। প্রদীপের সামনে দিয়ে কোনো পোকা মাকড় উড়ে গেল নিশ্চয়। ঠিক আছে, চলুন, ঘরেই যাই।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঘুঁটিসমেত পাশাটাকে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করলেন প্রৌঢ় পুরোহিত। তারপর সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, সবই তোমার ইচ্ছা মা।

মন্দির থেকে ফিরে আসার পর, জ্ঞানাতীত ভটচাজের বাইরের ঘরের জলচৌকিতে বসে তাঁর কথা শুনছিল অপূর্ব। জ্ঞানাতীত ভটচাজ বলে চলেছিলেন—

রাজা প্রীতম সিং-এর নামেই মহালের নাম প্রীতমপুর। 'রাজামশাই' বলে বটে লোকে, তবে আসলে প্রীতম সিং ছিল রাজপুত বেনিয়া। উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ এদের কথা ইতিহাসে পড়েছেন তো? ওদেরই সমসাময়িক। তার আসল ব্যবসা ছিল তেজারতি, মানে সুদে টাকা ধার দেওয়া। প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদের নবাবকেও টাকা ধার দিত। তাছাড়া বিনা ট্যাক্সে ব্যবসা করার সুলতানী ফরমান বেআইনিভাবে হাত বদল করত। এই সব করে অল্প সময়েই প্রচুর পয়সা করে ফেলেছিল।

তবে জগৎ শেঠ বা উমিচাঁদরা ছিলেন সংযমী, আর প্রীতম সিং উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চ 'ম'কারের প্রায় সবক'টাতেই ছিল ভয়ঙ্কর আসক্তি। তাই লক্ষ্মী যত তাড়াতাড়ি তার ঘরে এসেছিলেন, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন। শেষ দিকে জুয়া খেলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাতে উল্টে আরো তাড়াতাড়ি ফতুর হল।

পাশাটা কি তাহলে...?

ঠিক ধরেছেন। প্রীতম সিং-এর পাশা। ওই ছকেই বাজি রেখে জুয়া খেলা হত বলে শুনেছি।

তারপর?

দেখুন, আমার আদি বাড়ি তো এদিকে নয়। সবে বছর দুই হল এসেছি। তাই খুব বিশদে কিছু বলতে পারব না। তবে শুনেছি ওই খেলার জন্যেই কোনো এক হতভাগ্য প্রীতম সিং-এর হাতে খুন হয়েছিল।

খুন!

হ্যাঁ। বোধহয় তার কর্মচারীদের মধ্যেই কেউ হবে। একদিন নিজের সমকক্ষ কাউকে সঙ্গী না পেয়ে প্রীতম সিং ঝোঁকের মাথায় তাকে ডেকে খেলতে বলে। এলেবেলে ভাবে শুরু করেছিল। তারপর দেখা গেল সেই নতুন খেলোয়াড়ের অসম্ভব কপাল...কিম্বা হাতের কায়দা। ঘুঁটি চাললে সবচেয়ে বেশি নম্বরের ফোঁটা ছাড়া আর কিছু বেরোয় না তার হাত থেকে।

প্রীতম সিং-এর জেদ চেপে গেল। বাজি লাগিয়ে খেলা শুরু করল। প্রথমদিন যা হারল, দ্বিতীয় দিন সেটাই ফিরে পাওয়ার জন্যে বাজি লাগাল। দ্বিতীয় দিনে আবার হারল। তৃতীয় দিনে, চতুর্থ দিনে একই গল্প। প্রীতম সিং কী হেরেছিল, কত টাকা হেরেছিল জানি না, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিটা একসময় নিশ্চয় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অতএব পঞ্চম দিনে প্রীতম সিং-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সেই নতুন জুয়াড়ির মুন্ডুটা এক কোপে নামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করল প্রীতম সিং।

বলেন কী। তারপর?

লোকে বলে, ওই গুম খুন হওয়া মানুষটার অভিশাপেই দু-বছরের মধ্যে প্রীতমপুর ছারখার হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে প্রীতম সিং মারা গেল। তারপর এল গুটিবসন্তের মহামারি। যে-ক'টা লোক শহরে অবশিষ্ট ছিল তাদের মধ্যেও অর্ধেক সাবাড় হয়ে গেল পরের বর্ষায় ভাগীরথীর বন্যায়। বাকিরা শহর ছেড়ে পালাল। তখন থেকেই প্রীতমপুর এক পরিত্যক্ত শহর। আসবার পথে দেখলেন তো নিশ্চয় মহাল প্রীতমপুরের ধ্বংসাবশেষ?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে জ্ঞানাতীত ভটচাজ বোধহয় পাপের পরিণামের কথাই ভাবলেন। তারপর আবার শুরু করলেন—

জানেন বোধহয়, যে কোনো জমিদারি লাটে ওঠার পরে শেষ অবধি

যা থেকে যায়, তা হল দেবোত্তর সম্পত্তি। এখানেও তাই রয়েছে। এই মন্দির, আমার ঘর আর সামান্য পুকুর বাগান ধানজমি দেবী মুক্তকেশীর নামে দেবোত্তর করা আছে। কোনো রকমে পুরোহিতের বেতন আর দেবীর নিত্যপূজার খরচটা উঠে যায়।

আর মন্দিরের ভেতরে ওই সিন্দুকটার মধ্যে রয়েছে দেবীর কিছু অলঙ্কার, একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, পঞ্চমুখি রুদ্রাক্ষ আর ওই পাশার ছক। পাশার ছকটা কেন যে মন্দিরে রাখা আছে তা আমি জানি না। তবে এটা জানি, ওই পাশাকে মন্দির থেকে বার করলে ওটা আর থাকবে না। আমি গত দু-বছর ধরে দিনরাত অনুভব করি, কেউ একজন ওই পাশাটাকে হাতে পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে মানুষ নয়।

এইখানে অপূর্ব একটু শব্দ করে হেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টোদিকে বসে থাকা প্রৌঢ় কথকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। —হাসছেন? আপনি জানেন, আমার আগে যিনি পুরোহিত ছিলেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? ওই মন্দিরের দরজায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কোমর থেকে পা অবধি বাইরে, বাকি অর্ধেক ভেতরে। এক হাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন এই পাশা, আরেক হাতে দরজার চৌকাঠ। প্রবল টানে তাঁর কাঁধের হাড় খুলে গিয়েছিল, তবু মুঠো খোলেননি। সেবারে সে বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

কে বিফল হয়ে ফিরেছিল?

জানি না। জানলে তো আমার বউটাও মরত না। জানেন, সে কীভাবে মরেছিল?

নির্বাক অপূর্ব ঘাড় নাড়ল।

একটু আগে মন্দিরের ভেতরে যে লোহার সিন্দুকটা দেখলেন, সেটার গায়ে কপাল ঠুকে। আমরা ভোরবেলায় যখন মৃতদেহটা পাই তখন তার নাকমুখ সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার আগেও বহুবার সে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে ওখানে ছুটে গেছে, আর আমি তাকে ধরতে গেলে আমার পায়ে আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে বলেছে—ওগো ওটা আমাকে দাও, আমাকে দাও। নাহলে ও আমাকে ছাড়বে না।

কে ছাড়বে না? অপূর্ব জিগ্যেস করল।

আমিও তো রক্তিমার মাকে সেই কথাই জিগ্যেস করতাম—কে ছাড়বে না? তখন আর কিছু বলতে পারত না। ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

বলেন কী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যেই বলছি, আমার অন্নদাতার জিনিস বিক্রি করে আমি নেমকহারামি করব না। কিন্তু ওটাকে এখান থেকে বিদায় করব। ঈশ্বরেরও তাই ইচ্ছা, নাহলে তিনি আপনাকে এখানে পাঠাবেন কেন? নিয়ে যান, ও পাশা আপনি কালকেই নিয়ে যান।

আনন্দে উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না অপূর্বর। একজনের অহেতুক আতঙ্ক যে আরেকজনের এতটা উপকার করতে পারে এ তার ধারণা ছিল না। বউয়ের হিস্টিরিয়ার দৃশ্য দেখে পুরোহিতমশাই জিনিসটা তাকে এমনি এমনি দিয়ে দিলেন। ভাবা যায়? মানে পঞ্চাশহাজার টাকার পুরোটাই তার পকেটে।

ঘুম আসছিল না আরো একটা কারণে। সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে নারীসঙ্গ ছাড়া ঘুমোনোর অভ্যেসটাই চলে গেছে অপূর্ব ব্যানার্জির। নারী বলতে, কলকাতায় বা মুম্বইয়ে থাকলে, স্টুডিয়োর দরজায় অপেক্ষারতা অজস্র মেয়েদের মধ্যে যেটিকে পছন্দ হয়। আর অন্য শহরে এসকর্ট-সার্ভিসের রুম-ডেলিভারি।

কিন্তু এখানে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে কী হবে?

এখানে রাতটাকে যে মধুময় করে তুলতে পারে সে ওই যে দাওয়ায় বসে আছে। বিছানার পাশের জানলা দিয়েই তাকে দেখতে পাচ্ছে অপূর্ব। দেখতে পাচ্ছে তার সরু কোমর, ভারী নিতম্ব, ভরাট বুকের কিছুটা। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে আছে রক্তিমা।

পাশার বোর্ডে আঁকা নায়িকাদের ছবিগুলো অপূর্বর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ঘুরতে লাগল।

আচ্ছা, রক্তিমাই বা ঘুমোয়নি কেন? ও-ও কি কামার্ত? হতেই পারে। অপূর্ব যুবক, অপূর্ব সুদেহী। এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় এরকম সঙ্গী আগে কখনো পেয়েছে রক্তিমা?

বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে দাওয়ায় বেরোল অপূর্ব। কিন্তু বেরিয়ে এসে আর কাউকে দেখতে পেল না। এইটুকু সময়ের মধ্যে রক্তিমা কেমন করে নিজের ঘরে ফিরে গেল?

আর কিছু করার নেই। ওই ঘরেই জ্ঞানাতীতবাবুও ঘুমোচ্ছেন। ব্যর্থ মনোরথ অপূর্ব আবার নিজের বিছানায় ফিরে গেল এবং বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমিয়েও পড়ল।

ঠিক ঘুমটা আসার আগে তার হালকাভাবে মনে পড়ল, রক্তিমা খুব সেজেছিল। এত রাতে অত সেজেগুজে কেউ নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসে থাকে? কানে কানপাশা, বাহুতে মান্তাসা, কোমরে রুপোর গোঠ, বিনুনিতে জুঁইফুলের মালা।

অপূর্ব নিজের মনেই ভাবল, ধুর, স্বপ্ন দেখছি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোর থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আবার কোথাও একটা অকাল-সাইক্লোন তৈরি হয়েছে নিশ্চয়।

অপূর্ব একদমই রাজি ছিল না, তবু জ্ঞানাতীতবাবু কিছুতেই শুনলেন না। একটু ডাল-ভাত না খাইয়ে তিনি অপূর্বকে এতটা দূরের পথে কিছুতেই ছাড়বেন না। অগত্যা অপূর্ব স্নান করে তৈরি হতে লাগল। জ্ঞানাতীতবাবু মন্দিরে সকালের পুজো করতে চললেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনি খাওয়াদাওয়া করে ওখানেই চলে আসুন। জিনিসটা নিয়ে একেবারে রওনা দেবেন।

জ্ঞানাতীতবাবু বেরিয়ে যাবার পরে অপূর্ব ফাঁকা বাড়িতে রক্তিমাকে কুপ্রস্তাবটা দিয়েই ফেলল। বদলে সিনেমায় চান্স করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

পাথরের মতন কঠিন মুখে তার সামনে ভাতের থালা সাজিয়ে দিয়ে রক্তিমা বলল, যত তাড়াতাড়ি পারেন খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যান। বাবা পুরুষমানুষ, তাই বুঝতে পারেননি। আমি কাল থেকেই আপনার চোখে হ্যাংলামি দেখছি। নেহাত অতিথি, তাই...।

এরপরে আর ওই মেয়ের সামনে বসে খাওয়া যায়? কোনোরকমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে অপূর্ব মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল। কি ভেবে কপালে

হাত জড়ো করে মা-কে একটা প্রণামও করে ফেলল। জ্ঞানাতীতবাবু পাশার বোর্ডটা অপূর্বর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সাবধানে যাবেন।

অপূর্ব সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছিল। হঠাৎ-ই পেছন থেকে জ্ঞানাতীতবাবু ডাকলেন, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান তো ভাই।

অপূর্ব ঘুরে দাঁড়াল। জ্ঞানাতীত ভটচাজ এসে তার হাতে একটা ছোট মোড়ক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পকেটে রেখে দিন। মায়ের নির্মাল্য, সবরকম বিপদ থেকে আপনাকে বাঁচাবে। আচ্ছা, আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি প্রীতমপুর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন, ততই মঙ্গল।

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই গাড়ির রিয়ার-ভিউ-মিরর থেকে হারিয়ে গেল মুক্তকেশীর মন্দির আর প্রীতমপুর রাজবাড়ি। কিন্তু সামনে যে দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তার জন্যে অপূর্ব একেবারেই মানসিকভাবে তৈরি ছিল না। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল রক্তিমা। পরনে একটা সাদামাটা ডুরে শাড়ি। মাথায় একটা ছাতা পর্যন্ত নেয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা ভিজছে।

ও কখন থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে? রক্তিমার সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হাত বাড়িয়ে জানলার কাচ নামাল অপূর্ব। জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার?

অত্যন্ত মোহন ভঙ্গীতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্তিমা বলল, তুমি যা চেয়েছিলে তাতে আমি রাজি।

অপূর্ব গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু অপূর্ব একেবারেই তা টের পাচ্ছিল না। সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল রক্তিমাকে। এই মেঘলা আলোয় ওকে অলৌকিক সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখের মণিদুটো দিঘির মতন অতল। কপালে ভিজে চুলের গুছি লেপটে আছে। চিবুক থেকে ঝরা জল গলার ত্রিবলি ছুঁয়ে বুকের গভীর বিভাজিকার ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে। আদুল পেটের টানটান চামড়া বেয়ে পিছলে নামছে জলের ফোঁটা।

হঠাৎ মত পরিবর্তন?—জিগ্যেস না করে পারল না অপূর্ব।

খিল খিল করে হেসে উঠল রক্তিমা। বলল, তখন ছেনালি করছিলাম

গো, ছেনালি। বাড়ির ভেতরে ওসব করতে ভয় লাগবে না? কখন কে চলে আসে তার ঠিক নেই। চলো না ওখানে, সব বলছি।

রক্তিমা হাতের ইঙ্গিতে যেদিকে দেখাল, সেদিকে প্রীতমপুরের অনেক পোড়ো বাড়ির মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে আছে। সম্মোহিত অপূর্ব তখনই রক্তিমার পেছন পেছন সেদিকে রওনা দিচ্ছিল। রক্তিমাই ভ্রূভঙ্গি করে তাকে থামাল। বলল, ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই? গাড়িটা এভাবে রাস্তার ওপর পড়ে থাকলে লোকজন খোঁজ নেবে না?

মনে মনে জিভ কেটে অপূর্ব গাড়িটাকে রাস্তা থেকে পাশের ঢালে নামিয়ে একটা করমচা ঝোপের আড়ালে পার্ক করাল। রক্তিমা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। অপূর্ব দরজাটা লক করতে যেতেই সে বলল, ওটা নিয়ে এসো।

কোনটা? অবাক গলায় জিগ্যেস করল অপূর্ব।

পাশাটা। নিয়ে এসো, তারপর বলছি কেন।

প্রায় অন্ধকার ঘরটায় ঢুকেই রক্তিমা অপূর্বর গলায় হাতের বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল। অপূর্বর চোখের সামনে আবার পাশার ছকের ছবিগুলো নেচে উঠল। রক্তিমা মুখ তুলে অপূর্বর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, আমরা এবার পাশা খেলব, কেমন?

জিতলে আমি তোমার।

আর হারলে ওই পাশা আমাকে দিয়ে যাবে, ঠিক আছে?

রক্তিমার নিশ্বাসে কি মাদকতাময় গন্ধ! অপূর্বর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। সে শুধু বলতে পারল, কিন্তু আমি যে খেলতে জানি না।

চলো না শিখিয়ে দিচ্ছি। খুব সহজ খেলা। অপূর্ব খেয়াল করল না যে, সে ধুলোয় ভরা মেঝের ওপরেই বসে পড়েছে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিল, রক্তিমার ভারী উরু তার উরুর ওপরে চাপ দিচ্ছে। রক্তিমা পাশে বসে তাকে পাশা খেলার প্রথম পাঠ দিল। প্রথমবার ছকের ওপর ঘুঁটি চালল অপূর্ব।

ঘুঁটি চালল রক্তিমাও। রক্তিমার জিত। আবার ছক সাজাল রক্তিমা। তারপর ফিসফিস করে বলল, আমাকে তুমি হারাতে পারবে না।

কেন?—জিগ্যেস করল অপূর্ব।

এ আমার হাতের পাশা। এই পাশায় আমাকে কখনো হারানো যায়?

অপূর্বর মাথার মধ্যে সম্মোহনের ঘোর ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। সে দেখল রক্তিমার কানে কানপাশা, গলায় সাতনরী, কোমরে রুপোর গোঠ। রক্তিমার বিনুনিতে জুঁইফুলের গোড়ে মালা জড়ানো। রক্তিমার ঠোঁট পানের পিকে লাল হয়ে আছে। রক্তিমা যেন আর রক্তিমা নেই।

অপূর্ব আবার ঘুঁটি চালল। রক্তিমাও। এবারও রক্তিমার জিত।

অপূর্ব দেখল রক্তিমা বাঁ-হাতে দান দিল। সে বলল, বাঁ-হাতে দান দিলে যে?

খিলখিল করে হেসে উঠল রক্তিমা। বলল, ডান হাতটা প্রীতমবাবু কেটে নিলেন যে। আমার খেলা দেখে ওনার মনে হয়েছিল আমার হাতে যাদু আছে। তাই আমার ডান হাতটা কেটে নিলেন।

ঘুঁটি চালতে চালতে খুব স্বাভাবিক স্বরে অপূর্ব বলল, তবে যে পুরোহিতমশাই বললেন, কোন এক কর্মচারী মরেছিল। তার না কি মুন্ডু কেটে নিয়েছিল।

কর্মচারী বলে ভুল কী করল? আমি ছিলাম প্রীতমবাবুর বাঁধা রাঁড়। মোহরে মাইনে পেতাম। তবে হ্যাঁ, মুন্ডু কাটার কথাটা মিনসে ঠিক বলেনি। মুন্ডু কাটলে কম কষ্ট পেয়ে মরতাম। প্রীতমবাবু একদম কাঁধ থেকে আমার ডান হাতটা কেটে নিয়েছিল।

কেন? হাত কেটে নিল কেন?—সম্মোহিত অপূর্বর গলায় অবিকল কোনো রূপকথা-মুগ্ধ শিশুর সারল্য।

ওই যে বললাম। আমার খেলা দেখে বাবুর মনে হল, আমার হাতে তুক আছে। তাই হাতটা কেটে নিয়ে লালবাগের হাতির দাঁতের কারিগর হেমন্ত সর্দারকে দিয়ে বলল, যা, এটা দিয়ে এক সেট পাশা বানিয়ে দে। বাবু ভেবেছিল, ওই পাশা নিয়ে খেললে কেউ তাকে হারাতে পারবে না।

অপূর্ব ঘুঁটি চালল। বজ্রপাতের খুব ক্ষীণ আওয়াজ তার চেতনায় একটুখানি ঢুকে আবার হারিয়ে গেল। সে শুধু একবার মুখ তুলে দেখল রক্তিমার, কিম্বা রক্তিমার মতন দেখতে সেই মেয়েটার, ডান কাঁধের কাছটায় মাংস ডেলা পাকিয়ে রয়েছে।

মেয়েটা ছকের ওপর নিজের দান ফেলে মুখ তুলে বলল, তা হেমন্ত সেই পাশা বানিয়েও দিল। দেখছ তো কত সুন্দর বানিয়েছে। ওই যে,

কামকেলির ছবি আঁকা ছকটা—ওটা বানিয়েছে আমার সেই হাতের চামড়া দিয়ে। আর ঘুঁটিগুলো...ঘুঁটিগুলো কী দিয়ে বানিয়েছে বলো তো?

অপূর্ব আনমনে বলল, তোমার হাতের হাড় দিয়ে।

ঠিক বলেছো। কিন্তু এবারেও যে তুমি হারলে নাগর। তাহলে এই পাশা আমি নিয়ে যাই? নিজের একটা ছিন্ন অঙ্গ ফেলে রেখে কতকাল ঘুরে বেড়ানো যায় বলো। আমি তো আর সতী ছিলাম না।

ও নাগর, তোমার আপিত্য নেই তো?

অচৈতন্য অপূর্ব মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। আপত্তি থাকলেও তা প্রকাশ করবার মতন অবস্থা তখন তার ছিল না।
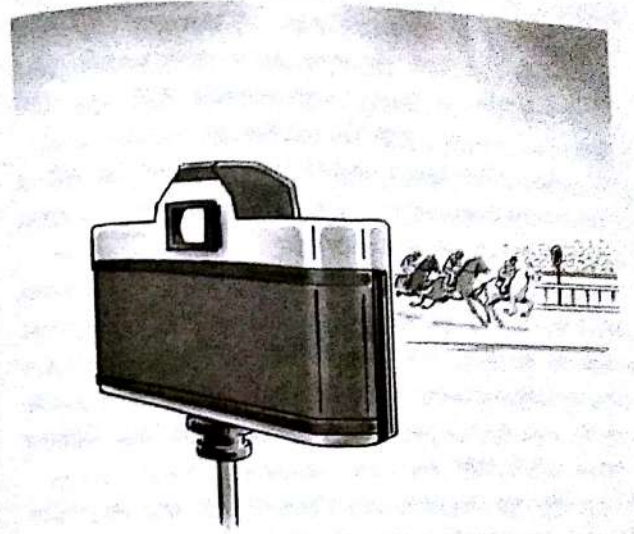
সূর্যাস্তের ছবি

এক

ফাঁকা দোকান। কাউন্টারের ওপাশ থেকে বোবা-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দোকানদার রতনচন্দ্র জাটি।

তারের বাঁধন ছিড়ে 'গ্যালাক্সি স্টুডিয়ো' লেখা টিনের সাইনবোর্ড একদিকে কেতরে পড়েছে। শো-কেসের কাচে জমাট ময়লা। দেয়ালে ঝুলন্ত ঠাকুরের আসনের ওপর বসে শুঁড় নাড়াচ্ছে প্রমাণ সাইজের একটা আরশোলা।

কতক্ষণ বাদে কে জানে, চায়ের দোকানের ছেলেটা চলটা-ওঠা

কাউন্টারের ওপরে ঠক করে একটা মাটির ভাঁড় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। রতনবাবুর ঘষা কাচের মতন চোখে একটু ছায়া পড়ল। তার হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল, যেন বুড়ো কচ্ছপের খোলসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সরু গলা। তারপর চা শেষ করে,খালি ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার শুধু চেয়ে থাকা আর চেয়ে থাকা।

দোকানটার দিকে একবার দেখলেই বোঝা যায় গ্যালাক্সি স্টুডিয়ো একটা আধমরা ব্যবসা আর তার মালিক রতন জাটি একজন হেরে যাওয়া মানুষ।

চাঁদনি মার্কেটের পেছনদিকে পাঙ্খা-গলি চেনেন কি আপনারা? সরু গলি। আলো ঢোকে না, হাওয়া ঢোকে না। ছোট-ছোট ঘরে স্তূপাকার আর্মেচার, ইলেক্ট্রিকের তার, বল-বেয়ারিং আর রঙের মধ্যে বসে হিন্দুস্থানি কারিগরেরা নানা মডেলের সিলিং-ফ্যান বানিয়ে চলেছে। অনেক নামকরা পাখা-কোম্পানি ওই পাঙ্খা-গলি থেকেই ফ্যান কিনে নিজেদের স্টিকার লাগিয়ে বিক্রি করে, আমরা জানতেও পারি না।

সে যাই হোক। ওই গলির ভেতরেই একটা ছোট ঘরে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্যালাক্সি স্টুডিয়ো নামে এই দোকানটা ব্যবসা চালাচ্ছে। এটাকে শুধু দোকান না বলে দোকান-কাম-ওয়ার্কশপ বলাই ঠিক। কারণ একসময় এখান থেকে ক্যামেরা, ফিল্ম, ফ্ল্যাশলাইট, ট্রাইপড এসব যেমন বিক্রি হত তেমনি ক্যামেরা সারানোর কাজও চলত। সত্যি কথা বলতে কি ক্যামেরা সার্ভিসিং-এর কাজটাই ছিল রতনবাবুর আসল ব্যবসা।

তখনও ক্যামেরা জিনিসটা আজকের মতন ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হত না। একটা অরিজিনাল জাপানি আসাহি-পেন্ট্যাক্স কিম্বা ইয়াসিকা ক্যামেরার জন্যে তখনকার হিসেবে অনেক টাকা খরচা করতে হত। তাই মালিকরা চাইতেন সারানোর সময় সেই ক্যামেরাটা যেন সত্যিকারের কাজ-জানা লোকের হাতে পড়ে। এ ব্যাপারে দারুণ সুনাম ছিল রতনচন্দ্র জাটির আর সেই সুনামের জন্যেই দূরদূরান্ত থেকে দামি ক্যামেরার মালিকেরা খুঁজেপেতে পাঙ্খাগলির ওই ঘুপচি দোকানে ভিড় জমাতেন।

রতন জাটির নিজের হাতে পত্তন করা এই দোকান। প্রথম যখন দোকান খোলেন তখন তার নিজের বয়স পঁচিশ। প্রথম পনেরো বছর

খুব ভালো ব্যবসা করেছিলেন। তার পরের দশ বছরও টেনেটুনে চলেছিল। কিন্তু গত দশ বছর যাকে বলে একেবারে 'মাছি তাড়ানোর দশা'। কারণ ডিজিটাল ক্যামেরার দাপট।

রতন জাটি বুঝতেন ম্যানুয়াল ক্যামেরার কলকব্জা। লেন্স বুঝতেন, প্রিজম বুঝতেন। ম্যানুয়াল ক্যামেরার পেটের ভেতরে যত কলকব্জা—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিভার, সেন্সর, মোটোর, ব্যালেন্স—সবই নিজের হাতের চেটোর মতন চিনতেন। কিন্তু তিনি মাইক্রোচিপস আর সার্কিট-বোর্ডের কিছুই বুঝতেন না। ফলে ডিজিটাল ক্যামেরা মার্কেট দখল করে নিতেই তিনি প্রায় বেকার হয়ে পড়লেন।

ইদানিং রতন জাটি সারাদিন উল্টোদিকের ইট বার করা বাড়িটার কার্নিশের দিকে তাকিয়ে আকাশপাতাল কী ভেবে চলেন তা আমাদের পক্ষে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব নয়, তবে আন্দাজ করতে পারি। আন্দাজ করতে পারি যে, তার চিন্তার অনেকটাই জুড়ে থাকে তার একমাত্র সন্তান, মা মরা মেয়ে অর্ণার ভবিষ্যৎ।

অর্ণার বয়স বত্রিশ, অথচ তার এখনো বিয়ে হয়নি। অর্ণা কানা নয়, খোঁড়া নয়। সে এই বত্রিশেও সুন্দরী, বাইশে তো তার রূপ ছিল মুনি-ঋষিদের মনভোলানোর মতন। তবু যে যথাসময়ে তার বিয়ে হয়নি তার একমাত্র কারণ, ঠিক ওইসময়েই, মানে অর্ণার যখন বাইশ বছর বয়েস, তখনই রতনবাবুর স্ত্রী মারা যান।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে মায়েদের যতটা চিন্তা থাকে অন্যদের তার সিকিভাগও থাকে না। এইজন্যেই মা-মরা মেয়েদের কপালে অশেষ দুর্গতি জমা থাকে। অর্ণার ক্ষেত্রেই বা অন্যরকম কিছু হবে কেন? রতনবাবু থাকতেন ব্যবসা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা যে একটা জরুরি কাজ সেটা তার খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হল একদিন যখন দোকান থেকে অসময়ে বাড়ি ফিরে অর্ণাকে দেখলেন পাড়ার উঠতি হেক্কোড় বাসুদেবের গায়ে গড়িয়ে পড়তে। তাও আবার রতন জাটির নিজের বাড়ির বৈঠকখানায়।

রতনবাবুদের পাড়াটা পুরোনো। বাসিন্দারা সবাই সবাইকে চেনে। পাশের বাড়ির শিবিপিসিমা সেদিন ইশারায় রতনবাবুকে ডেকে গলায়

নিমফুলের মধু ঢেলে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে যা বলেছিলেন তার সহজ অর্থ দাঁড়ায়—তোমার মেয়ে বেটাছেলের ছোঁয়া পাবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে রতন। ওকে যেভাবে হোক পার করো।

শিবিপিসিমার কথাটা শুনে গা রি-রি করে উঠলেও সেটাকে সত্যি বলে বুঝতে অসুবিধে হয়নি রতন জাটির। সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। দশবছর আগে অর্ণার বিয়ে দেওয়াটা যেমন সহজ ছিল, আজ দশবছর বাদে তা ততটাই কঠিন। অর্ণার বয়স বেড়ে গেছে। দোজবরে ছাড়া তার সঙ্গে মানানসই পাত্র পাওয়া মুশকিল। তার চেয়েও বড় কথা রতনবাবুর ট্যাঁক একদম গড়ের মাঠ। মেয়ের বিয়ে, তাও বয়স্থা মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যে পরিমাণ টাকাপয়সা লাগে, তাকে বিক্রি করে দিলেও আজ সে পয়সা আসবে না।

তাহলে উপায়?

গ্যালাক্সি স্টুডিয়োতে দু-চারজন লোকের এখনো যাতায়াত রয়েছে। তারা অ্যান্টিক ক্যামেরার কালেকটর। নিজেদের কালেকশনের পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছরের পুরোনো দুষ্প্রাপ্য সব ক্যামেরাকে সচল রাখার জন্যে তারা রতন জাটির কাছে আসেন। সেরকমই একজন হলেন উত্তরপাড়ার মিলনকৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে রতনবাবুর থেকে অনেক ছোট—এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর হবে। কিন্তু রতনবাবুকে নাম ধরে তুমি বলে ডাকেন। ঘুণধরা জমিদার বাড়ির ছেলে, তবে এখন জমিদারির বদলে প্রোমোটারি আছে। দুটো অফ-শপ মদের দোকানও আছে। রমরমা বিক্রি। মদ মেয়েছেলে কোনো কিছুতেই মিলনকৃষ্ণের অনাসক্তি নেই।

রিসেন্টলি মিলনকৃষ্ণ মুখুজ্জে হাতিবাগানে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেটা জমিদারদের বাগানবাড়ির আধুনিক বিকল্প। ওখানেই মিলনকৃষ্ণ আজকাল বেশিরভাগ সময় কাটান। সেই ফ্ল্যাটে রতনবাবু যেমন গিয়েছেন, মিলনকৃষ্ণও কয়েকবার রতনবাবুর বাড়িতে এসেছেন।

পুরোনো পরিচিত হিসেবে তার কাছেই একদিন কথায় কথায় রতনবাবুর মনের দুঃখ, মনের চিন্তাগুলোর কথা বলে ফেলেছিলেন। মিলনকৃষ্ণ শুনেই বললেন, ছি ছি ছি রতন। আমাকে আগে বলবে তো। কলকাতায় থাকো, পা বাড়ালেই অমন চমৎকার রেসের মাঠ। এখানে কেউ টাকাপয়সার অভাবের কথা বলে? টাকা এখানে ডিম পাড়ে। চলো, আজই চলো।

সেদিন সত্যিই রতন জাটি মিলনকৃষ্ণের সঙ্গে রেস খেলতে গিয়েছিলেন এবং দুশোটাকা লাগিয়ে পঁচিশশোটাকা জিতেছিলেন। পরের দিনও মিলনকৃষ্ণের সঙ্গেই মাঠে গিয়েছিলেন এবং হাজারটাকা লাগিয়ে আটহাজার টাকা জিতেছিলেন। 'বিগিনারস লাক' কথাটা রতন জাটির জানা ছিল না।

পরের শনিবার রতনবাবু একাই রেসের মাঠে গিয়েছিলেন। মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে সবেমাত্র তার আগের দিনই বহু পুরোনো একটা জার্মান ক্যামেরা এক কালেকটরকে পঁচিশহাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই পুরো টাকাটা পকেটে নিয়েই সেদিন রতন জাটি মাঠে ঢুকেছিলেন এবং পঁচিশহাজারই হেরেছিলেন।

এসব ক্ষেত্রে হারা-টাকা উশুল করার একটা রোখ চেপে যায়। রতনবাবু সেই দশার মধ্যে ছ'মাস কাটিয়ে যখন ফের ধাতস্থ হলেন ততদিনে তার অস্থাবর সম্পত্তি শূন্যের ঘরে এসে ঠেকেছে। তার মধ্যে সবক'টা পুরোনো আমলের অ্যান্টিক ক্যামেরা আর তার মৃতা স্ত্রীয়ের গয়নাগুলোও ছিল; মানে যে গয়নাগুলো দিয়ে তিনি অর্ণার বিয়ে দেবেন বলে ভেবেছিলেন।

এরপর আর তিনি মাঠমুখো হননি। ওই একটু আগে যেমন বলেছি, বারোটা থেকে আটটা পর্যন্ত চুপচাপ দোকানের কাউন্টারে বসে থেকে বাড়ি ফিরে যেতেন।

দুই

এই সময়েই একদিন সন্ধে সাতটা-সাড়ে-সাতটা হবে, রতনবাবু সবে দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছেন; হঠাৎ একটা সিড়িঙ্গে মতন লোক এদিক ওদিক তাকিয়ে সুট করে দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল।

লোকটা তার মাথায় মুখে জড়িয়ে রাখা ক্যাটকেটে লাল রঙের মাফলারটা খুলবার পর রতনবাবু দেখলেন তার বয়স বেশি নয়। তেল

চুপচুপে চুল, চড়িয়ে ভাঙা গাল, কুতকুতে চোখ আর পানের রসে ভিজে ঠোঁট দেখলে বলে দিতে হয় না যে ব্যাটাছেলে বিহারি। বোধহয় কোনো বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভার কি চাকর হবে। ছেলেটার প্রথম কথাতেই রতনবাবু নিশ্চিত হলেন যে, তার অনুমান ঠিক। ছেলেটা ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কাকু, থোড়া অন্দর চলিয়ে না।

দোকানের পেছনদিকে আরেকটা ছোট ঘর রয়েছে, যেটা তিনি ক্যামেরা সারানোর কাজের সময় ব্যবহার করেন। সেদিকেই চোখের ইশারা করল ছেলেটা।

রতনবাবু পোড় খাওয়া লোক। এইধরনের ছেলে-ছোকরা দোকানে কী মতলবে আসে তা তার অজানা নয়। তিনি দ্বিরুক্তি না করে ছেলেটাকে নিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকলেন, তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে উত্তর কলকাতার মার্কামারা ঘটি-হিন্দিতে বললেন, দিখাও তো দেখি, কেয়া লায়া হ্যায়।

সেই ছেলেটাও চট করে রতনবাবুর হাতে একটা ক্যামেরা তুলে দিল। রতনবাবু আলোর নীচে ক্যামেরাটাকে একবার দেখেই একটা হেঁচকি তোলার মতন আওয়াজ করলেন। ক্যামেরা নিয়ে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। এ জিনিসের কথা শুনেছেন অনেক, ফোটোগ্রাফির বিদেশি ম্যাগাজিনে ছবিও দেখেছেন কয়েকবার। কিন্তু চর্মচক্ষে দেখার সুযোগ আগে কখনো হয়নি। হবে কেমন করে? রতনবাবু যতদূর জানেন, গোটা ওয়েস্ট-বেঙ্গলের এবং সম্ভবত গোটা ইন্ডিয়ার কোনো ক্যামেরা-কালেকটরের কাছে এই জিনিস নেই।

সেটা ছিল পোলারয়েড কর্পোরেশনের প্রথম যুগের একটা ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় শাটার টেপার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। ক্যামেরাটা যে খুব দামি তা কিন্তু নয়। বরং উলটো। এগুলো ছিল একেবারে সস্তার ক্যামেরা। আজকের ভাষায় বলতে গেলে 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'।

এই মডেলের ক্যামেরার পেটের ভেতরে মোট কুড়িটা ছবি তোলার মতন ফিল্ম ভরা থাকত। নতুন করে আর ফিল্ম ভরা যেত না। কুড়িটা ইনস্ট্যান্ট ফোটো হাতে এসে গেলেই ক্যামেরাটার কাজ শেষ। তখন সেটা

ওয়েস্টবিনে ফেলে দিয়ে ছবিগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাও —এই ছিল আইডিয়া। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অতদিন আগেও ক্যামেরাটায় রঙিন ছবি উঠত।

আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মধ্যে ক্যামেরার ওই মডেলটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদেশি ম্যাগাজিনে ওই মডেলের ক্যামেরায় তোলা বেশ কিছু ছবি রতনবাবু দেখেছেন। সবই প্রায় সি-বিচের ছবি। স্বল্পবসনা সুন্দরীদের ছবি। বিয়ার-মাগ হাতে নিয়ে উচ্ছল যুবকদের ছবি। হাইওয়ের ধারে দামি গাড়িতে জার্নির সময়ে তোলা ছবিও দেখেছেন কয়েকটা।

রতনবাবু জানতেন, ক্যামেরাগুলো ফেলে দেওয়া হত বলেই সেগুলো আজ এত দুর্লভ। সেরকম একটা দুর্লভ ক্যামেরাই এই ছোকরা আজ তার কাছে নিয়ে এসেছে। কোথা থেকে সে এটা পেল সেকথা জিগ্যেস করলেন না রতনবাবু। চোরাই মালের কারবারে ওরকম প্রশ্ন করার নিয়ম নেই। বরং গলায় যতদূর সম্ভব উদাসীনতা মাখিয়ে জিগ্যেস করলেন, ছোকরা এটার জন্যে কত দাম আশা করে?

কাকু, ইয়ে কিমতি চিজ হ্যায়। হাজার রুপৈয়াকে নীচে নেহি মিলেগা।

রতনবাবু আবার একটা হেঁচকি তুলতে যাচ্ছিলেন। কোনোরকমে সামলালেন। এ ছোঁড়ার তো দাম সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, মনের খুশি মনে চেপে রেখে তিনি বললেন, দাঁড়া বাবা। পহেলে এক প্রিন্ট লেকে দেখতা হ্যায় চলছে কি না। রতনবাবু ক্যামেরার ফিল্ম-কাউন্টারের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে দেখলেন নম্বর দেখাচ্ছে ১২। তার মানে এগারোটা ছবি তোলা হয়ে গেছে। কুড়িটার মধ্যে ন'টা ফিল্ম তখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি দোকানের সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালেন। জনমানবহীন রাস্তা। একটা নেড়ি কুকুর অবধি কোথাও নেই। তবে উলটো দিকে ইট বার করা বাড়িটা আছে। হ্যালোজেন আলোর ল্যাম্পপোস্ট আছে। একটা ঠেলাগাড়ি দাঁড় করানো আছে। এগুলোর ছবি যদি আসে তাহলেই বোঝা যাবে ক্যামেরাটা কাজ করছে। রতনবাবু ফাঁকা রাস্তার দিকে তাক করে শাটার টিপলেন।

আধ মিনিটের মধ্যেই দিব্যি স্মুদলি একটা প্রিন্ট বেরিয়ে এল। ফোটোটা দেখে রতনবাবুর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তিনি

বুঝতে পারলেন ক্যামেরাটার ওপর সময় তার দাঁত বসিয়েছে। ফোটোটা বেশ ঝাপসা এসেছে। তাছাড়া ওটার ঠিক মাঝখানে কীসব ছায়া ছায়া মতন দাগও পড়েছে। তবে রতনবাবু জানতেন তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, এ ক্যামেরা তিনি যাকেই বিক্রি করুন সে তো আর ছবি তুলবার জন্যে কিনবে না। জাস্ট জিনিসটা নিজের অধিকারে রাখবার জন্যেই কিনবে। এবং রতনবাবুর আন্দাজ এটা বিক্রি করে তিনি হাজার পঞ্চাশেক টাকা অনায়াসেই পেয়ে যাবেন।

তবু তিনি প্রিন্টটা বিহারি ছোকরার চোখের সামনে ধরে বললেন, দেখো। কিতনা বাজে পিকচার আয়া হ্যায়। ইয়ে গন্ধা মাল হ্যায়। ইসকে লিয়ে তুমকো হাম পাঁচশো রুপিয়া দেগা।

ছেলেটা বেশ ঝুলোঝুলি করছিল। শেষমেষ সাতশো টাকা দিয়ে রতনবাবু ক্যামেরাটা রেখে দিলেন।

সেদিন দোকান থেকে বেরোতে রতনবাবুর স্বাভাবিকভাবেই একটু দেরি হয়ে গেল। তিনি তার ওয়ার্কশপে বসে নতুন সম্পদটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। হঠাৎ মেঘ ডাকার শব্দে তার চমক ভাঙল। পরক্ষণেই আকাশ ভেঙে অসময়ের বৃষ্টি নামল। রতনবাবু মনে মনে বললেন, আজ ভোগাবে।

বৃষ্টি পড়েই চলেছিল। রতনবাবু দোকানের কাউন্টারে বসে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রবল বৃষ্টিতে সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছিল। তার মধ্যেই একটা পরিবার ভিজতে ভিজতে গ্যালাক্সি স্টুডিয়োর এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। বাবার কোলে একটা বছর তিনেকের ছেলে। মায়ের হাত ধরে বছর পাঁচেকের ফ্রক পরা মেয়ে। রতনবাবু আপনমনে বলে উঠলেন, ছবির মতন।

নিজের ওই কথাটা তার নিজের কানেই ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল। তিনি আবার নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন, 'ছবির মতন?' তার চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল গোল হয়ে উঠল। তিনি ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে চোখে লাগিয়ে একটু আগে তোলা সেই ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। কোনো সন্দেহ নেই, ছবিটাতে এখনকার এইমুহূর্তের বৃষ্টির দৃশ্য ধরা পড়েছে। ল্যাম্পপোস্ট ঠেলাগাড়ি, ইট বার

করা দেয়াল—সবকিছুর ওপরেই জলের ভারী পর্দা। সেইজন্যেই সবকিছু এমন ঝাপসা লাগছে। তাছাড়া মাঝের ওই কালো দাগগুলো সাধারণ দাগ নয়। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া পরিবারটার ছবি, ওই একটু আগে যারা দোকানের এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। সেই বাবার কোলে ছেলে, মায়ের হাত ধরে মেয়ে। না, কোনো ভুল নেই।

কিছুক্ষণ পরে যা হবে তার ছবি এই আশ্চর্য-ক্যামেরা আগেই ফিল্মের ওপর ধরে রেখেছে।

তিন

পরদিন ভোরবেলায় রতন জাটি ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের বাড়ির ছাদে উঠলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠিক পাশের বাড়ির ছাদটার দিকে তাক করে শাটার টিপলেন। তার পরেই ঘড়িটা দেখে নিলেন। ছ'টা বাইশ।

ছ'টা বেজে সাড়ে-বাইশ মিনিটে পোলারয়েড ক্যামেরা থেকে প্রিন্ট বেরিয়ে এল। ছবিতে পাশের বাড়ির ছাদ, চিলেকোঠা, কাপড় মেলবার তার, পাঁচিলের ওপর তুলসীগাছের টব সবই রয়েছে। বেশ পরিষ্কারভাবেই রয়েছে। উপরন্তু তাও রয়েছে যা এই মুহূর্তে নেই। রয়েছে এক মাঝবয়সি গিন্নিবান্নি চেহারার মহিলার ছবি। তিনি কামানের গোলার মতন তুঙ্গ দুই বুকে একটা ঠেঁটি গামছা জড়িয়ে, তারে ভিজে ব্লাউজ মেলছেন।

রতনবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে সত্যিই সেই সিক্তবসনা মহিলা বুকে ভেজা গামছা জড়িয়ে, কাচা কাপড়ের বালতি হাতে নিয়ে ছাদে উঠে এলেন। প্রতিবেশী হিসেবে রতনবাবু ওই মহিলাকে বিলক্ষণ চেনেন। পাশের বাড়ির কানাই শিকদারের পুত্রবধূ। ভারি দজ্জাল।

মহিলা রতনবাবুকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে কাপড় মেলতে শুরু করলেন। যখন ঠিক সেই ফোটোর সিচুয়েশনটা এলো, মানে সায়া শাড়ি ইত্যাদি মেলে দেওয়ার পরে মহিলার হাতে লাল রঙের ব্লাউজটা উঠে এল, তখনই রতনবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। ছ'টা বেজে বাহান্ন

মিনিট। রতনবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি ঘোরলাগা দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে চকিত সুখের হাসি। এ-ও কি সম্ভব? ঠিক আধঘণ্টা পরে যা হবে তার ছবি তুলে রেখেছে তার আশ্চর্য ক্যামেরা!

কিন্তু সেই সুখের ঘোর বেশিক্ষণ রইল না। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে কয়েকটা বাক্য ভেসে এল।—আ মরণ! ঘাটে যাবার বয়স হল তবু মেয়েছেলে দেখার শখ মিটল না! ওইজন্যেই বউটা মরে বেঁচেছে।

জ্বালাময়ীর কথার জ্বালায় হুঁশ ফিরে পেয়ে রতনবাবু ক্যামেরা বুকে জড়িয়ে দুড়দাড় করে নীচে নেমে এলেন।

সেদিন তিনি আর দোকানে গেলেন না। অনেকদিন বাদে মোড়ের তেওয়ারির দোকান থেকে কচুরি আর জিলিপি কিনে আনলেন। স্নানের সময় অনেকদিন বাদে পরিষ্কার করে নতুন ব্লেডে দাড়ি কামালেন। আলমারি থেকে ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি করা প্যান্টশার্ট বার করে পরলেন, সে-ও অনেকদিন বাদে। অর্ণা পুরো সময়টাই অবাক হয়ে বাবাকে দেখছিল। বাবা যখন ভাত খেতে বসে ঠিকে-রাঁধুনি রমলাদির রাঁধা ছ্যারছেরে মুসুরডালের প্রশংসা করে বসল, তখন সে আর না পেরে জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছ বাবা?

একটু ইয়ের দিকে যাচ্ছি মা, মানে অ্যাকাডেমিতে একটা ফোটোগ্রাফির এগজিবিসন আছে। বিবেক...বিবেক ব্যানার্জি। ভারি ভালো ছবি তুলছে ছেলেটা। একটু দেখে আসি। তুমি সাবধানে থাকবে। বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবে না, কেমন?

গলির মোড় থেকে একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে উঠে পড়লেন রতন জাটি। বললেন, চলো রেসকোর্স।

রেসের মাঠে পৌঁছিয়ে রতনবাবু দেখলেন তখনো রেসুড়েরা কেউই প্রায় এসে পৌঁছোয়নি। কেনই-বা আসবে? রেস শুরু হতে তখনো তো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি রয়েছে। রতনবাবু আরাম করে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে গ্যালারিতে উঠে বসলেন এবং বোতলে চুমুক দিতে দিতে রেসের বইটা খুলে দেখতে শুরু করলেন সেদিন কোন কোন ঘোড়া দৌড়চ্ছে, কোন ঘোড়াকে চালাচ্ছে কোন জকি, কোন ঘোড়া কোন লেনে দৌড়চ্ছে ইত্যাদি।

রেস শেষ হবার সময়টা তার জানা ছিল। বিকেল চারটে বেজে কুড়ি মিনিট। ঠিক তার আধঘণ্টা আগে রতনবাবু ফিনিসিং-পয়েন্টের কাছাকাছি গিয়ে খালি মাঠটার দিকে তাক করে ক্যামেরার শাটার টিপলেন। যথারীতি সড়সড় করে একটা ফোটোর প্লেট বেরিয়ে এল। বলাই বাহুল্য সেই ফোটোয় মাঠটাকে খালি দেখাচ্ছে না। বরং দেখাচ্ছে এক তীব্র উত্তেজনাময় ছবি—আটটা ঘোড়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের এদিকে ওদিকে ফিনিশিং-লাইন টাচ করছে। ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রথম ফিনিশিং-লাইন পেরোচ্ছে তিননম্বর লেনের ঘোড়া।

রতনবাবু পকেট থেকে রেসের বইটা বার করে আবার পাতা ওলটালেন। এই রেসে তিননম্বর লেনে দৌড়বে মর্নিং-গ্লোরি নামে ঘোড়াটা। বই থেকেই দেখা যাচ্ছে ঘোড়াটা আগে কখনো এরকম বড় রেসে দৌড়য়নি, জেতা তো দূরের কথা। সেইজন্যেই মর্নিং-গ্লোরির দর দশে এক। অর্থাৎ কেউ যদি মর্নিং-গ্লোরির নামে এক টাকা লাগায়, সে মর্নিং-গ্লোরি জিতলে পাবে দশটাকা।

রতনবাবু পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বার করে বুকিং কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

রেস শেষ হল। মর্নিং-গ্লোরিই জিতল। রতনবাবু থুতু দিয়ে পাঁচহাজার টাকা গুনে নিলেন এবং পুরো টাকাটা নিয়েই আবার বুকিং-কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য-ক্যামেরার কল্যাণে ততক্ষণে পরের রেসের বিজয়ী ঘোড়ার নামটাও তার জানা হয়ে গেছে। বাবা মুস্তাফা।

বাবা মুস্তাফার দর ছিল একে আট। পাঁচহাজার টাকা লাগিয়ে রতন বাবু পেলেন আটগুণ টাকা, মানে চল্লিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ রতনবাবু সেদিন পাঁচশো টাকা নিয়ে রেসকোর্সে ঢুকেছিলেন, কিন্তু বেরোলেন চল্লিশহাজার টাকা নিয়ে।

বাড়ি ফেরার পথে রতনবাবু একবার ভাবলেন মেয়েটার জন্যে কয়েকটা জিনিস কিনে নিয়ে যাবেন। অর্ণা বাড়িতে যে নাইটি না কি পরে ঘোরে, সেটার পিঠের কাছটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তাছাড়া কাল রাতেই

মেয়েটার ঘর থেকে সারারাত ফটফট করে মশা মারার আওয়াজ আসছিল। বেচারার মশারিটা চোদ্দো জায়গায় ফেঁসে গিয়েছে। একটা মশারি কিনলেও হয়। মা-মরা মেয়েটার জন্যে কতদিন কিছু কিনে নিয়ে যাননি।

কিন্তু শেষ অবধি কিছু কিনলেন না রতনবাবু। খালি হাতেই বাড়ি ঢুকলেন। যতক্ষণ আশ্চর্য-ক্যামেরায় ফিল্ম রয়েছে ততক্ষণ প্রত্যেকটা টাকার দশগুণ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এখন টাকাগুলোকে হাতে রাখতে হবে। এরকমটাই ভাবলেন রতনবাবু।

পরের শনিবারেও তিনি রেসের মাঠে গেলেন। রেস শেষ হবার ঠিক আধঘন্টা আগে আশ্চর্য-ক্যামেরায় ফিনিশিং-লাইনের ছবি তুললেন এবং যথারীতি বিজয়ী ঘোড়ার পরিচয় জানতে পারলেন। সেদিন দুটো রেসে রতনবাবুর চল্লিশ হাজার টাকা ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠল তিনলাখ সত্তরহাজার টাকা। ক্যাশ। রতনবাবু পুরো টাকাটাই পরের শনিবারের জন্যে তুলে রাখলেন। শুধু পাড়ার দোকান থেকে দুটো ডিম কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অর্ণাকে বললেন—রাতে ডিমের ডালনা করিস। রুটি আর ডিমের ডালনা, অনেকদিন খাইনি।

অর্ণা যখন চলে যাচ্ছে তখন রতনবাবু দেখলেন ওর গায়ে একটা নতুন নাইটি। পরদিন ভোরে মেয়ের ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, নীল নেটের নতুন মশারির মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে অর্ণা। রতনবাবুর মনে সন্দেহ জাগল—অর্ণা কি তার তবিল থেকে টাকা সরাচ্ছে?

চার

পরের শনিবার রতন জাটি রেসের মাঠে গেলেন তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা পকেটে নিয়ে। পোলারয়েড ক্যামেরার ছবি দেখে তার মনে হয়েছিল চার নম্বর লেনের ঘোড়া টমবয় উইনার। তিনি টমবয়ের ওপরে পুরো টাকাটাই লাগিয়ে দিলেন।

এবং পুরো টাকাটাই হারলেন।

বোর্ডে উইনারদের নাম টাঙিয়ে দেওয়ার পর রতনবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উইনার টমবয় নয়, রাজাসাহেব বলে অন্য একটা ঘোড়া।

তার পায়ের তলার মাটি টলমল করছিল। তিনি আকাশপাতাল হাতড়ে একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এটা কেমন করে হল? কী করে হল? ক্যামেরা তো এর আগে কখনো ভুল করেনি।

গ্যালারির এক কোনায় বসে রতনবাবু পকেট থেকে শেষ ছবির প্রিন্টটা বার করে সেটার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ দেখার পরে তার মনে হল তিনি বোধহয় ভুলটা ধরতে পেরেছেন। হ্যাঁ, ক্যামেরার নয়, তারই ভুল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সবক'টা ঘোড়াই ফিনিশিং-লাইন পেরিয়ে গেছে এবং তাদের সবার আগে রয়েছে টমবয়। তার ঠিক পেছনেই রাজাসাহেব স্প্রিন্ট করছে। কিন্তু ফিনিশিং লাইনে নিশ্চয় রাজাসাহেবই সবার আগে পৌঁছেছিল, টমবয় তখন ছিল পেছনে। তার পরে, ফলো-থ্রুতে টমবয় তাকে টপকে গেছে। কিন্তু তাতে তো কিছু আসে যায় না। উইনার রাজাসাহেবই।

তিনি ফিনিশিং-লাইনের পরের ছবি দেখে বাজি ধরেছেন। উচিত ছিল ফিনিশিং লাইনের ঠিক আগের ছবি দেখা। তার ক্যামেরার শাটার টিপতে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর তাতেই এই বিপত্তি।

কিন্তু এখন কী করা যায়? রতনবাবু ক্যামেরার ফিল্ম-কাউন্টারের দিকে তাকালেন। ১৯ সংখ্যাটা জ্বলজ্বল করছে। তার মানে আর দুটো মাত্র ফিল্ম অবশিষ্ট রয়েছে। এই দুটো ফিল্মে তিনি কতটা ভাগ্য ফেরাতে পারেন? এই মুহূর্তে তার পকেটে ষাট-সত্তর টাকা পড়ে আছে। সেই টাকা নিয়ে খেলা শুরু করা যায় নাকি?

আমজনতার জন্যে মাঠের এককোনায় জলের ট্যাপ রয়েছে। সেখানে গিয়ে রতনবাবু অনেকক্ষণ ঘাড়ে মাথায় জল থাবড়ালেন। তারপর মাথাটা একটু ঠান্ডা হলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্রাম ধরে হাতিবাগানের দিকে চললেন। গন্তব্য মিলনকৃষ্ণ মুখুজ্যের বাড়ি। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। এই আশ্চর্য ক্যামেরা তিনি বিক্রি করে দেবেন, অবশ্যই এর আশ্চর্য

ক্ষমতার কথা না জানিয়ে। শুধু এক অসামান্য অ্যান্টিক হিসেবেই এটার জন্যে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে পারেন। তারপর সেই টাকা আর শেষ দুটো ফিল্ম নিয়ে আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবেন।

তার জন্যে অবশ্য মিলনবাবুর কাছে একটা আবদার করতে হবে। ওনাকে বলতে হবে ক্যামেরাটা তিনি ওনাকে হ্যান্ড-ওভার করবেন এক সপ্তাহ বাদে, মানে পরের শনিবার রাতের দিকে। এতদিনের চেনা লোক, এইটুকু মেনে নেবেন নিশ্চয়ই।

স্টার থিয়েটারের পেছনদিকের গলিতে মিলনকৃষ্ণের ফ্ল্যাটটা নতুন এবং বিশাল। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে মিলনকৃষ্ণের দরজার কলিংবেলের সুইচে চাপ দিলেন। দরজা খুলে মিলনকৃষ্ণ এতটাই চমকে গেলেন যে রতনবাবু তো অবাক। একথা ঠিকই যে তার আসার কথা ছিল না। মোবাইলে হয়তো আগে একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল, সেটাও তিনি দেননি। কিন্তু তাতে এত চমকাবার কী আছে? শুধু চমকে যাওয়া নয়, মিলনকৃষ্ণ যেন তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন বলেই মনে হল রতনবাবুর।

অবশ্য সামলেও নিলেন খুব তাড়াতাড়ি। ঘরে ঢুকিয়ে বললেন, খুব অসময়ে এসেছ হে রতন। আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে। হাতে পাঁচমিনিটও সময় নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

ডাঁহা মিথ্যে কথা—মনে মনে ভাবলেন রতনবাবু। কোথাও বেরোবার কথা নেই মিলনকৃষ্ণের। ব্যাটা সিল্কের ফতুয়া আর বাটিকের লুঙ্গি পরে বসে আছে। মিউজিক সিস্টেমে গজল বাজছে। ওদিকে কর্নার টেবিলে ভদকার বোতল, লাইম কর্ডিয়াল, কাজুর প্লেট। পুরোপুরি ছুটির মুডে রয়েছে মিলনকৃষ্ণ। তাহলে তাকে এত তাড়াতাড়ি ভাগাতে চাইছে কেন? হয়তো বিজনেসের ব্যাপারে কোনো লোক-টোক আসবে। আন্ডার-হ্যান্ড ডিল হবে। যাগ্গে, এখানে বেশিক্ষণ সময় কাটাবার ইচ্ছে রতনবাবুরও নেই। তিনি কাঁধের শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে ক্যামেরাটা বার করে মিলনকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে দিলেন।

মিলনকৃষ্ণের মতন বুঝদার খরিদ্দারদের নিয়ে সুবিধে এটাই যে, তাদের কাছে ক্যামেরার পেডিগ্রি নিয়ে বেশি কিছু বলতে হয় না। এই

এখনই যেমন, ক্যামেরাটা একবার দেখেই ওনার চোখদুটো কপালের কাছাকাছি উঠে আবার নেমে এল। হাত বাড়িয়ে রতনবাবুর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবাশ। বিক্রি করতে চাইছ?

রতনবাবু ঘাড় হেলালেন।

কত দেব?

রতনবাবু বললেন, আপনাকে আর কী বলব? এ জিনিসের দাম তো আপনি জানেন।

দাঁড়াও তাহলে। ক্যাশেই দিয়ে দিচ্ছি। ভেতরের ঘর থেকে হাজার টাকার নোটে দেড়লাখ টাকা নিয়ে এসে রতনবাবুর হাতে তুলে দিলেন মিলনকৃষ্ণ। বললেন, দামটা হয়তো এর থেকে একটু বেশিই হয়। কিন্তু আপাতত আমার কাছে এই আছে। পরে পুষিয়ে দেব। আচ্ছা তুমি এবার এসো। আমাকে তৈরি হতে হবে।

রতনবাবু পায়ে চটি গলাতে গলাতে কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেললেন তার আবদারটা। ক্যামেরাটা আর এক সপ্তাহ আমার কাছে থাকতে দিতে হবে স্যার। আর দুটো ফিল্ম রয়েছে, ও দুটো আমি তার মধ্যে খরচা করে ফেলব।

মিলনকৃষ্ণ মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন, থাক না, থাক না। তুমি তো আর পালাচ্ছ না। আর ছবিও তুলে নাও। তবে এত পুরোনো ফিল্ম। ছবি কি আর ঠিকঠাক আসবে? রতনবাবু ভাঙলেন না যে, ইতিমধ্যেই তিনি আঠারোটা ছবি তুলে ফেলেছেন এবং অভাবনীয় রেজাল্ট পেয়েছেন।

আর কিছু বলবার সুযোগও ছিল না অবশ্য। এক হাতে ক্যামেরাটা রতনবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে প্রায় তার মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিলেন মিলনকৃষ্ণ। কেলেঙ্কারিটা হল ঠিক এই সময়েই। পাল্লার ধাক্কা থেকে ক্যামেরাটা বাঁচাবার জন্যে সেটাকে একটু তাড়াতাড়িই বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন রতনবাবু। সেইসময়েই কেমন করে যেন শাটারের ওপর তার হাত পড়ে গেল। একপলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল ক্যামেরার ভেতরের কলকবজা। তার মুখের ওপর দরজাটাও বন্ধ হল আর সঙ্গে সঙ্গেই সড়সড় শব্দ করে বেরিয়ে এল উনিশ নম্বর ছবির

প্রিন্ট।

সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে রতনবাবু দেখলেন সেই ছবি। আধখোলা দরজার ভেতর দিয়ে দেখা মিলনকৃষ্ণের বসার ঘর, যে ঘরটা তিনি এইমাত্র ছেড়ে এলেন। তবে এ ছবি তো এখনকার নয়, আরো আধঘণ্টা পরের। তাই এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মিলনকৃষ্ণ মুখুজ্যে তার সোফার ওপরে একটা মেয়েকে চিত করে শুইয়ে মুখটাকে নামিয়ে আনছেন মেয়েটার মুখের ওপর। মেয়েটার হাসিহাসি মুখটা দরজার দিকে ফেরানো, তাই চিনতে অসুবিধে হয় না। সে রতনবাবুর আত্মজা—অর্ণা।

ফোটোটাকে কুচি কুচি করতে করতে এমন একটা সময় এল যখন ছোট টুকরোগুলোকে আর নতুন করে ছেঁড়া যাচ্ছিল না। তখন রতন জাটি সেগুলোকে চাতালের দেয়ালের গায়ের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিলেন। তারপর নেমে এলেন রাস্তায়।

পাঁচ

কোন রাস্তা ধরে কোনদিকে যে হাঁটছিলেন রতনবাবু কিছুই তিনি জানতেন না। যেন ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলেছিলেন। শুধু একটা দুঃস্বপ্নের মতন মাথার ভেতর নড়াচড়া করছিল মিলনকৃষ্ণ আর অর্ণার সেই জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকা ছবিটা।

যখন হুঁশ ফিরল তখন তিনি গঙ্গার ধারে চক্ররেলের একটা স্টেশনে বসে আছেন। প্লাটফর্মের ওপাশেই স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড। আর তার পরেই গঙ্গা।

রতনবাবুর বুকের ভেতর সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যেও কোথাও একজন ফোটোগ্রাফার চুপ করে বসেছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, বাঃ।

রতনবাবু চমকে উঠলেন। 'বাঃ' মানে?

'বাঃ' নয়? দ্যাখো না বাঁদিকে রুপোর বিছের মতন হাওড়া ব্রিজ। শুনশান প্লাটফর্ম। রেললাইনের দুপাশে কত বুনোগাছ গজিয়েছে। কত প্রজাপতি উড়ছে। ভালো লাগছে না দেখতে?

রতনবাবু একটু ভেবে বললেন, লাগছে তো।

সামনে তাকিয়ে দ্যাখো—গঙ্গার ওপাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে। একটা সাদা ধবধবে মন্দির, বোধহয় হাওড়ার বাঁধাঘাটেই হবে, সূর্যাস্তের আলোয় গোলাপি হয়ে উঠেছে। নৌকার পালগুলোতেও রং ধরেছে। ঠিক ছবির মতন। ভালো লাগছে না তোমার?

রতনবাবু বিরসমুখে ফোটোগ্রাফারকে বললেন, লাগলেই বা কী?

'কী' মানে? ক্যামেরাটা তো তোমার কাছেই রয়েছে। একটা স্ন্যাপ নাও না। তার মধ্যে সবকিছুকেই ধরবার চেষ্টা করো। এই প্ল্যাটফর্ম, ওই নদী...।

না, হবে না।

কেন হবে না?

একটা বড় সমস্যা আছে। আমার এই ক্যামেরাটা একটু অদ্ভুত। এখন যদি শাটার প্রেস করি তাহলে আধঘণ্টা পরের ছবি আসবে। তখন তো সবকিছুর ওপর ছায়া পড়ে যাবে।

তা হোক না। তাতে হয়তো অন্যরকম একটা সৌন্দর্য ধরা পড়বে। অন্ধকার নেমে আসার ঠিক আগের মুহূর্তটাকে ভালোবাসো না তুমি?

বাসি, বাসি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁধের ঝোলা থেকে ক্যামেরাটাকে বার করে গলায় ঝোলালেন রতনবাবু। ফিল্ম-কাউন্টারের দিকে তাকালেন। ২০। শেষ ফিল্ম। নিজের অজান্তেই তার হাতটা একবার ছুঁয়ে এল ব্যাগের ভেতরে টাকার বান্ডিলটা। কত টাকা আছে যেন? দেড়লাখ, তাই না? আচ্ছা ক্যামেরাটার দাম কি এত বেশি হবে? না কি মিলনকৃষ্ণ এর মধ্যে অর্ণার মাংসের দামটাও ধরে দিল? ভাবলেন তিনি।

রতনবাবুর বুকের ভেতর থেকে ফোটোগ্রাফার ধমকে উঠল—আবার ওইসব ডিপ্রেসিং কথাবার্তা নিয়ে ভাবছ? ওদিকে আলো যে পড়ে আসছে। শাটারটা টেপো।

রতনবাবু অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ফোকাস করলেন। তারপর আশ্চর্য-ক্যামেরায় শেষবারের মতন শাটার টিপলেন।

ছবিটা ভালোই এল। থেঁতলানো নখের মতন কালচে নীল আকাশ। তার গায়ে রক্তমেঘের দু-একটা লম্বা আঁচড়। নদীর বুকে নৌকায় নৌকায়

আলো জ্বলে উঠেছে। ছবির ফ্রেমের একেবারে সামনে সূর্যের শেষ আলো মেখে শুয়ে রয়েছে দুটো রেল-লাইন আর তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। মাথাটা ট্রেনের চাকার ধাক্কায় কোথায় যে ছিটকে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে না। তবে লোকটার কাঁধের ঝোলাটা একটু দূরেই পড়ে রয়েছে। সেটার ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে একরাশ নোট'।

ছবিটা মন দিয়ে দেখতে দেখতে রতনবাবুর মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। তিনি ফোটোগ্রাফারকে ডেকে বললেন, ওহে ওস্তাদ! এইজন্যে ছবিটা তোলার ব্যাপারে এত তাড়া দিচ্ছিলে? তুমি কি ভাবো, কিছুই জানি না? আমি কি এখানে এমনি এমনি এসেছি নাকি?
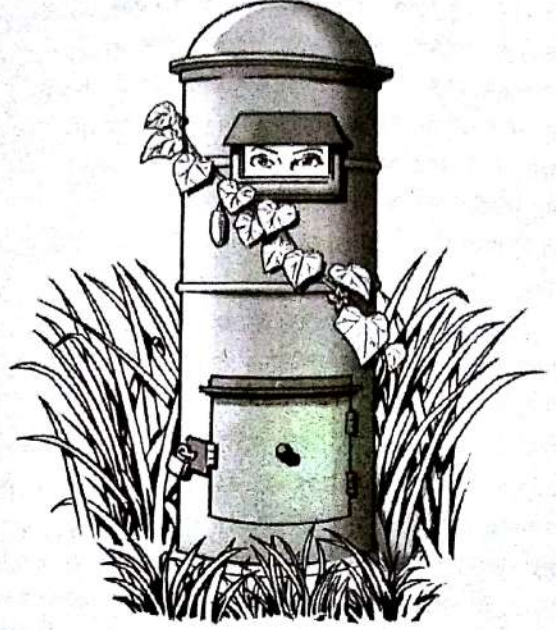
হাতকাটা মেয়ের হারমোনিয়াম

গলসী স্টেশনের লাল-সিমেন্টের বেঞ্চির ওপরে দু-হাতের মধ্যে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন অমলেন্দুদা—কবি অমলেন্দু মুন্সী। পাশে আমি। অমলেন্দুদা বিড়ি খাচ্ছিলেন, আমি খাচ্ছিলাম পাঁচ টাকা প্যাকেটের চিনেবাদাম। ওনাকে বাদামের ভাগ দিতে গিয়েছিলাম...নিলেন না। বললেন, তুমি খাও। কখন বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ। আমি তো কিছুই খাওয়াতে পারলাম না।

সত্যিই খিদে পেয়ে গিয়েছিল। সকাল এগারোটায় হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে পৌঁছেছিলাম বর্ধমান। সেখান থেকে আবার আসানসোল লোকালে গলসী। এখন বাজে বিকেল সাড়ে চারটে। মাঝখানের পুরো সময়টায় পেটে কিছুই পড়েনি। খিদে পাবে না?

এসেছিলাম ওই অমলেন্দুবাবুর খোঁজেই। কেন এসেছিলাম বলি।

আমরা তিন বন্ধু মিলে একটা কবিতা-পত্রিকা বার করি, নাম 'কিন্নর'। লিটল ম্যাগাজিন। খুব খেটেখুটে সংখ্যাগুলো বার করি বলে কবিতা-প্রেমীদের মধ্যে কিন্নরের চাহিদা আছে। ঠিক করেছিলাম সামনের বইমেলায় সত্তরের দশকের কবিদের নিয়ে একটা সংখ্যা বার করব। সত্তরের সাতজন বিশিষ্ট কবির প্রত্যেকের দশটা করে কবিতা থাকবে, অ্যানালিসিস সমেত। সঙ্গে থাকবে অল্পকথায় জীবনী আর ইনটারভিউ।

এ-ও ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, খুব নামকরা কবিদের পেছনে দৌড়বো না। কারণ, ইতিমধ্যেই তাদের নিয়ে অনেক পত্র-পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যা বেরিয়ে গিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, তাদের ইনটারভিউ ইত্যাদি পাওয়ার ঝামেলাও বেশি। তাই সাতজন শক্তিমান অথচ আন্ডার-রেটেড কবির নাম বেছে নিয়েছিলাম।

তাদের মধ্যেই একজন অমলেন্দু মুন্সী, যিনি গত চল্লিশ বছরে কিছুই লেখেননি। অথচ একাত্তর-বাহাত্তর সালে এই মানুষটারই লেখা 'অন্ধের আয়না' কিম্বা 'দহনমন্ত্র'র মতন অনেক কবিতা তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে ফিরত।

আমরা ভেবেছিলাম, এই হারিয়ে যাওয়া কবিকে খুঁজে বার করতে পারলে চারিদিকে হইহই পড়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, অমলেন্দু মুন্সীর ঠিকানা ফোন নম্বর কিছুই জানতাম না। শুধু এইটুকুই জানতাম যে, ওনার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার গলসীতে। সেই সূত্র ধরেই আজ অমলেন্দু মুন্সীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গলসী স্টেশনে নেমে লোকজনকে জিগ্যেস করতে শুরু করেছিলাম—অমলেন্দুবাবু বলে কাউকে চেনেন? কবি অমলেন্দু মুন্সী? কোথায় বাড়ি বলতে পারবেন?

পঁচিশ-তিরিশজন গলসীবাসী সেই প্রশ্ন শুনে ঘাড় নেড়ে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ-ই একজন মাঝবয়েসি মহিলা বললেন, বাজারে গিয়ে যমুনা প্রিন্টার্সে খোঁজ করুন। অমলদা ওখানেই কাজ করেন। যমুনা প্রিন্টার্সে গিয়ে সত্যিই অমলেন্দুবাবুকে পেয়ে গেলাম।

আমাদের হিসেব মতন ওনার এখন বয়স হবে সত্তর, কিন্তু সামনাসামনি দেখে মনে হল আশি পেরিয়ে গেছে। হাড়-জিরজিরে শরীর। একটা চেককাটা নোংরা লুঙ্গি পরেছিলেন, তার ওপরে খদ্দরের কোঁচকানো মোচকানো পাঞ্জাবি আর নস্যিরঙের চাদর। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, পুরোটাই ধবধবে সাদা।

গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িরও সেই একই অবস্থা। একটা চৌকির ওপরে উবু হয়ে বসে প্রুফ দেখছিলেন। পরে জেনেছিলাম, ওটাই ওনার চাকরি।

আমি নমস্কার করে আমার আসার উদ্দেশ্য জানাতে ভেতরের ঘরে গিয়ে বোধহয় মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এলেন। তারপর আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললেন, চলো ভাই, প্লাটফর্মে গিয়ে বসি। নিরিবিলি সুন্দর জায়গা।

মিনিট পাঁচেক হেঁটে আবার সেই প্লাটফর্মে ফিরে এলাম, যেখানে একটু আগে এসে নেমেছিলাম।

এসব লাইনে একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা অন্তর ট্রেন আসে। মাঝের এই সময়টায় শূন্য-প্লাটফর্মে শিশুগাছের ছায়ায় শালিখ পাখিরা খেলা করছিল। দূরে একটা রাইস-মিলের চিমনির ধোঁয়া উত্তুরে হাওয়ায় বারবার কী যেন একটা ছবি এঁকেই আবার মুছে ফেলছিল। অনেকদূর থেকে ভেসে আসা একটা বসন্তবৌরি-পাখির টুং টুং ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দও ছিল না এই শেষ বিকেলের রেলস্টেশনে।

অমলেন্দুদা একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সিমেন্টের বেঞ্চিটা ঘসে ঘসে মুছলেন। তারপর কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, বিশ্বাস করছ না তো? সত্যি করেই মৃত্যু ঘটেছে আমার। নাহলে কুকুরগুলো আমাকে দেখলেই অমন তারস্বরে চিৎকার করে কেন? তোমার নামটা কী যেন বললে ভাই?

এই নিয়ে তৃতীয়বার বললাম, কুশল মিত্র।

হ্যাঁ, কুশল। সমস্যাটা আমার একার নয়, আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বেশ কয়েকজনেরই মৃত্যু হয়েছিল ওই সময়। ওই ধরো উনিশশো একাত্তর-বাহাত্তরে।

উত্তরে কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ওনার প্রথম এক-দুটো কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, আজকের পুরো চেষ্টাটাই বৃথা গেল। এর চেয়ে যদি শুনতাম অমলেন্দু মুন্সী মারা গেছেন, তাহলেও বোধহয় এতটা হতাশ লাগত না। কিন্তু ইনি তো বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন, অথচ কবিতা নিয়ে উনি কিছুই বলবেন না, বলতে পারবেন না। কারণ, ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

একটু আগে, আমরা যখন ছাপাখানার ভেতর থেকে সবে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি, তখন হঠাৎ একটা গলাখাকারির আওয়াজে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম যমুনা প্রিন্টার্সের মালিক দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ঘুরে

তাকাতে দেখে উনি নিজের মাথার ওপরে ডান হাতের তালুটা তিন-চার পাক ঘুরিয়ে বাঁ-হাতে অমলেন্দুবাবুকে দেখালেন। তারপর চোখ কুঁচকে হাসলেন।

ওনার ইশারা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তবু ভেবেছিলাম, সব কবিই তো অল্পবিস্তর দিব্যোন্মাদ। হয়তো ইনিও তাই। হয়তো সেই উন্মাদনার মধ্যেই এমন কোনো কথা বলে বসবেন যা পড়ে কিন্নরের পাঠকেরা ধন্য ধন্য করে উঠবে।

কিন্তু হায়, এ তো দেখছি মৃত্যুর স্বপ্নে ডুবে থাকা একটা লোক। তখন থেকে একটাই কথা বলে যাচ্ছেন — উনি মৃত। ওনার অগুরুর গন্ধ ভালো লাগে। ওনার সঙ্গে মৃত মানুষদের কথাবার্তা হয়। ঘুম না এলে উনি কপালে চন্দন আর চোখের ওপরে তুলসীপাতা চাপিয়ে শুয়ে থাকেন। তাতে নাকি চমৎকার ঘুম এসে যায়।

শেষ চেষ্টা হিসেবে একবার ওনাকে বললাম, দেখুন অমলেন্দুদা, আপনি যদি মরেই গিয়ে থাকেন, তাহলে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন কীভাবে? রুক্ষ দেখছেন কীভাবে? বিড়ি খাচ্ছেন কীভাবে? আপনাকে তো তাহলে বহু আগেই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দিত, তাই না?

উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। ভ্যাম্পায়ারের কামড় খেয়ে যারা মরে, তাদের সৎকার হয় না। তারা নিজেরাও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়।

আমি এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেললাম। বললাম, আপনি ভ্যাম্পায়ার?

আমি একা নই। এই গলসী শহরে আমার বয়সি আরো চারজন মানুষ ভ্যাম্পায়ারের জীবন কাটাচ্ছে। তবে দিনকালের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হয়। এখন নিয়ম-রক্ষার মতন দিনে এক দু-ফোঁটা নররক্ত খাই।

কোত্থেকে পান?

সেটা আমাদের সমিতির গুপ্ত কথা। তোমাকে বলতে পারব না।

কী আর বলব? বুঝতে পারছিলাম, সব কথাই চুপচাপ হজম করে যেতে হবে। কবি অমলেন্দু মুন্সীকে যে খুঁজে পেয়েছিলাম সে-কথা কোথাও লেখা যাবে না, কারণ এসব কথা লেখা মানেই ওনার শান্তি নষ্ট করা। একজন আধপাগলা মানুষ পৃথিবীর এক কোনায় নিজের উদ্ভট ধারণা নিয়ে পড়ে আছেন, থাকুন না। কারুর কোনো ক্ষতি তো করছেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলাম। ডাউন-ট্রেন আসতে এখনো একঘণ্টা দেরি আছে। ততক্ষণ বসে থাকা ছাড়া উপায় কী? পাশে বসে অমলেন্দু মুন্সী একটু ভারী গলায় গুণগুণ করে তাঁর ছোটোবেলার কি যেন

গল্প বলে চলেছিলেন। প্রথমটায় পাত্তা দিইনি। কিন্তু মন দিয়ে এক দুটো লাইন শুনতেই বঁড়শিতে মাছের মতন গেঁথে গেলাম।

এই মানুষটার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি, না-খেতে-পাওয়া চেহারা। এনার বাঁ দিকের চশমার কাচ-টা ফাটা, ইনি আমার চোখের সামনেই আধখানা বিড়ি খেয়ে বাকিটা দেশলাই-বাক্সের মধ্যে জমিয়ে রাখলেন। তবু বেশ বুঝতে পারছিলাম, একসময় এই মানুষটাই শব্দের প্রভু ছিলেন। সেই শব্দসিদ্ধি এখনো ওনাকে ছেড়ে যায়নি।

এমন সুন্দর করে উনি কথা বলে যাচ্ছিলেন, এমন অল্প কথায় তুলে আনছিলেন হারানো একটা সময়কে যে, সেই গল্প একটু একটু করে চোরাবালির মতন আমাকে নিজের ভেতরে টেনে নিচ্ছিল। আমার চোখ থেকে মুছে গেল দু-হাজার-ষোলোর গলসী স্টেশন, কান থেকে মুছে গেল বসন্তবৌরির ডাক। আমি সম্মোহিতের মতন শুনতে শুরু করলাম সেই কাহিনি।

দুই

কুশল, কুশল বললে তো তোমার নাম? শোনো কুশল। এখন তুমি গলসী জায়গাটাকে যেরকম দেখছ, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সেরকম ছিল না। আমাদের জ্ঞান হওয়ার পর দেখেছিলাম এক অদ্ভুত মায়াময় শহর।

'মায়া' শব্দটার দুরকম মানে হয়, জানো নিশ্চয়? মারীচ রাক্ষস ছিল মায়াবী, কারণ, সে জাদু জানত। জাদু জানত আমাদের ছোটবেলার গলসী শহরটাও। চেনা রাস্তাও তখন হঠাৎ হঠাৎ অচেনা হয়ে যেত। বর্ষাকালে রাস্তার দুপাশের নয়ানজুলি ভরে উঠত ছোট ছোট নীলরঙের কলমি ফুলে। গ্রীষ্মে সেই একই নয়ানজুলির শুকনো বুক আবার লাল হয়ে যেত ঝরে পড়া কৃষ্ণচূড়ায়।

একদিন ক্যানালের পাড়ে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি। একটা বস্তা ভাসতে ভাসতে আমাদের সামনে আঘাটায় এসে ঠেকল। এখনো মনে আছে, বৃষ্টিধোয়া বিকেল ছিল সেটা। আকাশে অদ্ভুত হলুদ একটা আলো ফুটেছিল। সেই কনে দেখা আলোয় দেখেছিলাম, বস্তাটার মধ্যে থেকে অপূর্ব লাবণ্যময় দুটো পা বেরিয়ে রয়েছে। গুরুভার উরু থেকে আলতা পরা পায়ের পাতা অবধি—নিটোল, ফর্সা, নির্লোম দুটো মেয়েমানুষের পা—সোনার মতন ঝকমক করছিল।

সেই যে দশ বছর বয়সে ওই দৃশ্যটা দেখে ফেললাম, তারপর থেকে কোনোদিনও আর নারীর নগ্নতা থেকে মৃত্যুকে আলাদা করতে পারিনি। যখনই সঙ্গম করেছি, তা যেন শবের সঙ্গে।

আমাদের ছোটবেলায় এই মফস্বল শহরের মেয়েরা ফ্রক পরে স্কুলে যেত। তারা দুহাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে থাকত বঙ্গলিপি খাতা আর হোম-সায়েন্সের বই। ওই ছিল তাদের লজ্জার আড়াল। ওইভাবেই সেই বারো-তেরোর মেয়েগুলো তাদের বুকে সদ্য গজিয়ে ওঠা কুঁড়িগুলোকে আড়াল করে পথ চলত। আমার মতন অ্যাডোলেসেন্ট ছেলেরা আড়চোখে চেয়ে দেখতাম। ভালো করে বুঝতাম না সবকিছু।

আমার যখন পনেরোবছর বয়স তখন গলসী পোস্টঅফিসে পোস্টমাস্টার হয়ে এলেন প্রবোধ সরকার। প্রবোধবাবু আমাদের পাড়াতেই একটা একতলা বাড়ি ভাড়া নিলেন।

প্রবোধবাবু, ওনার স্ত্রী আর ওদের মেয়ে কেয়া—এই তিনজনের সংসার। কেয়া আমাদের পাড়াতেই বড় হতে লাগল। একা-একা রাস্তায় বেরোতে শুরু করল। আর ওর বুকের দিকে তাকিয়েই আমরা মেয়েদের স্তনের উদ্গম থেকে উন্নতি অবধি পুরো পর্যায়টা জলের মতন বুঝে গেলাম। রাস্তায় বেরোলে বেচারা কেয়া অন্য মেয়েদের মতন বুক আড়াল করতে পারত না। কিছুই আড়াল করতে পারত না। কারণ, কেয়া জন্মেছিল দুটো হাত বাদ দিয়ে। নাক, চোখ, পা, পিঠ, বুক, পাছা—সব ঠিক ছিল। শুধু হাতদুটোই ছিল না। কাঁধের পর থেকে একদম ল্যাপাপোছা, প্লেন। কাকিমা ফ্রকের হাতাগুলো মুড়ে সেলাই করে দিতেন। সেই সব ফ্রক পরে কেয়া রাস্তার দিকে চোখ নামিয়ে হাঁটত।

তোমাকে বললাম কি, কেয়ার মুখটা ছিল খুব সুন্দর? পানপাতা গড়নের মুখ, ছোট্ট কপাল, টিকোলো নাক। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, কুশল? কেয়ার চোখ কেমন ছিল জানতাম না। কেন বলো তো? আসলে ও তো কোনোদিন কারুর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাদের শিউরে ওঠা মুখের ভাব ও দেখতে চাইত না।

ন'বছরের কেয়া উনিশ বছরের হল। পনেরো বছরের আমি পঁচিশে পৌঁছলাম। আমার সমস্ত কবিতার মধ্যে গোপনে কেয়ার কথা থাকত, যদিও আমি কেয়ার প্রেমে পড়িনি। কেয়ার মতন হাতকাটা মেয়ের প্রেমে পড়া কী কারুর পক্ষে সম্ভব? জানি না। আমার শুধু ভীষণ মায়া লাগত ওর জন্যে।

সেই মায়াটাই কবিতা হয়ে ফুটে বেরোত।

অদ্ভুত ব্যাপার, কেয়ার জন্যে ওর মা-বাবার মনে কোনো মায়া ছিল না। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

তোমার বয়স কত কুশল? ছত্রিশ? তাহলে তুমি ঘরে-ঘরে টিভি ঢুকে যাওয়ার অনেক পরে জন্মেছ। তোমার কাছে 'এনটারটেইনমেন্ট' শব্দটার মানেই আলাদা। আমাদের এনটারটেইনমেন্ট ছিল দোলের মেলায় পুতুল-নাচ, মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা, পুজোর পরে খোলা মাঠে পাড়ার গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে জলসা আর নাটক।

আরো কিছু কিছু ইউনিক জিনিস ছিল। যেমন, অবিরাম-সাইকেল আর হাতকাটা মেয়ের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করা।

হ্যাঁ, প্রবোধবাবু পোস্টমাস্টার হঠাৎই একদিন তার মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিলেন। খুব হঠাৎ নয়। প্ল্যান একটা নিশ্চয়ই ছিল। নাহলে মেয়েকে অত যত্ন করে গানই বা শেখাবেন কেন?

বিভিন্ন বড় মাপের জলসায় কেয়া ওর মায়ের সঙ্গে স্টেজে উঠতে শুরু করল। এর জন্যে তখনকার দিনে প্রবোধবাবু তিনশোটাকা করে চার্জ করতেন। তবে কেয়া যখন একপা দিয়ে হারমোনিয়ামের বেলো টেনে অন্য পায়ের আঙুল দিয়ে রিড টিপে মধুর সব সুর তুলত আর তার সঙ্গে মিঠে গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে শুরু করে একের পর এক বোম্বে-ফিল্মের গান গেয়ে যেত, তখন উদ্যোক্তাদের পয়সা উশুল হয়ে যেত। শুধু গানই নয়, শো-এর মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে প্রবোধবাবু এবং তার স্ত্রী কেয়াকে দিয়ে অঙ্কটঙ্কও করাতেন। সবই সে করত পায়ের আঙুলে খাতা-কলম ধরে।

আমি মাঝে মাঝে কেয়ার এরকম দু-একটা পারফর্মেন্স দেখেছি, কিন্তু আমার ভালো লাগত না। আমি দেখতাম, কেয়া একঘন্টার প্রোগ্রামের মধ্যে একবারের জন্যও চোখ তুলত না। কষ্ট হত, খুব কষ্ট হত আমার।

এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটল। প্রবোধবাবুর স্ত্রী, মানে কেয়ার মা, এনকেফেলাইটিসে মারা গেলেন। অন্য পরিবারে হলে এটাকে হয়তো বিনামেঘে বজ্রপাত বলা যেত। কিন্তু পোস্টমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বিশেষ কিছু বদল এল না। কেয়া তার অদ্ভুত সক্ষম দুটো পায়ের সাহায্যে ঘরসংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে যেত। গানের রেওয়াজ করত। পুজোর পর থেকে গোটা শীতকালটা জুড়ে চুটিয়ে ফাংশান করত। শুধু ওর মাথায় বিনুনিটা আর

দেখতাম না। চুল এলো হয়ে থাকত। নিজের পা দিয়ে নিশ্চয় নিজের বিনুনি বাঁধা যায় না।

তিন

খুব দ্রুত সন্ধে নেমে আসছিল। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমার কলকাতায় ফেরার ট্রেন আসতে এখনো আধঘন্টা দেরি আছে।

স্টেশনের চারিদিকে মাইল মাইল ধানখেত। ধান কাটা হয়ে গেছে। সেই ফাঁকা খেতের ওপরে এখানে-ওখানে সাঁজালের নীল ধোঁয়া জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। রেললাইনের বেড়ার ধারে আকন্দের ঝোপে মুঠো মুঠো জোনাকি জ্বলছিল। -

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এত গুছিয়ে যিনি কথা বলতে পারেন, তার মাথায় কেমন করে ভ্যাম্পায়ারের ভূত ঢুকে গেল? না কি পুরোটাই অমলেন্দুদার চালাকি? কোনো একটা ফ্রাস্ট্রেশন থেকে নিজের কবিসত্তাকে কিছুতেই পরের প্রজন্মের সামনে বার করবেন না। সেইজন্যেই পাগল সেজে বসে আছেন?

অমলেন্দু মুন্সী একটা বিড়ি ধরিয়েছিলেন। একটু পরে সেটাকে টুসকি মেরে রেললাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, বলছিলাম না, শহরটার অনেক মায়া ছিল? সেটা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারতাম মুসাফিরের গলিতে ঢুকলে।

আমি বললাম, কেয়ার কথা কী বলছিলেন যে?

উনি বললেন, গলিটার কথাও বলতে হবে। আমার বিশ্বাস মুসাফিরের গলির মতন একটা জায়গা না থাকলে ভ্যাম্পায়ারের জন্ম হত না।

বলুন তাহলে।

গলিটা ছিল আমাদের বাড়ির গায়েই। একদিকে মুন্সীবাড়ির টানা লম্বা দেয়াল, অন্যদিকে একটা ভবঘুরে আশ্রমের পাঁচিল। মাঝখানে ওই সরু গলিটা পায়ে হেঁটে পেরোতে সময় লাগত এই ধরো মিনিট সাতেক।

নাম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই অদ্ভুত ছিল ওই গলিটার। কে মুসাফির, সে কবেকার লোক কিছুই জানতাম না। ভাবো তো, যে লোক মুসাফির, মানে সোজা বাংলায় পথিক, তার কেন শুধু একটা সরু গলি থাকবে? তার তো

থাকা উচিত পুরো পৃথিবী।

গলিটার একদিকে জমজমাট বাজার, অন্যমুখে একটা বিশাল পোড়ো জমি। এই অদ্ভুত কম্বিনেশনের জন্যেই মুসাফিরের গলি ধরে কেউ যাতায়াত করত না।

যাতায়াত না করলেও গলিটায় ঢুকে পড়ত কিন্তু অনেকেই। তার মানে, জায়গাটার একটা অদ্ভুত টান ছিল। আমিই তো খিড়কি-দরজা খুলে বেরিয়ে কত ঘুঘুডাকা দুপুরে, কত তারাখসা সন্ধের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছি ওই গলির এককোণে।

শহরের মাঝখানে একটা গলি, তার দেয়ালে জাত-সাপের খোলশ ঝুলছে, পাঁচিলের ফোকর থেকে মুখ বাড়াচ্ছে ভুতুম প্যাঁচা, ভাম। ভাবা যায়? যখন কোথাও কোনো হাওয়া নেই তখন ওই গলির মধ্যে ঝড়ের মতন হাওয়া বইত। যখন কোথাও কুয়াশা নেই, তখন রাশি রাশি কুয়াশায় ঢেকে যেত গলির একফালি আকাশ। তার মধ্যেই ভেসে আসত আশ্রমবাসী ভবঘুরেদের বিষণ্ণ কীর্তন। মনে হত, এক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে যেন অনেক দূর দিয়ে ভেসে যাওয়া অন্য এক জাহাজের নাবিকদের গান শুনছি।

একাত্তর সালের সেই বসন্তকালটা জীবনে ভুলব না। এমন তীব্র বসন্ত তার আগে কিম্বা তার পরে কখনো দেখিনি। এত পলাশ, এত কোকিল, এত নেশা-ধরানো হাওয়া—নাঃ, দেখিনি। আমরা গলসী শহরের যুবক-যুবতীরা মাতাল হয়ে গেলাম। দীওয়ানা হয়ে গেলাম। হাতে হাতে গোপন ইস্তাহারের মতন ঘুরতে লাগল প্রেমের চিঠি। এই রেললাইনেই একমাসের মধ্যে গলা দিল দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে। আর বললে বিশ্বাস করবে না, কেয়া প্রেগন্যান্ট হল।

ওই নুলো মেয়েটাও কি ভালোবাসা পেয়েছিল? না কি শুধু শরীরটাই কেউ ভোগ করে গেল? সে কে? কিছুই জানতে পারলাম না।

চৈত্রমাসের এক সন্ধ্যায় প্রবোধবাবু চোরের মতন আমার ঘরের জানলায় টোকা মেরে ডাক দিলেন, তোমাদের মধ্যে কারুর বি পজিটিভ ব্লাড আছে? বি পজিটিভ? আমার মেয়েটার ব্লাড লাগবে, অনেক ব্লাড। ওর শরীর থেকে সব রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। অমু, তুমি তো আমার ছেলের মতন, কেয়া তোমার বোন। শিগগির চলো বাবা, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চলো। আমার মেয়েটাকে বাঁচাও।

ওই বয়সে আমরা প্রায়ই ব্লাড-ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত দিতাম। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কার কোন গ্রুপের রক্ত মুখস্থই ছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে চটপট সেরকম চার বন্ধুকে ডেকে নিলাম যাদের বি পজিটিভ গ্রুপের ব্লাড—শঙ্কু, রতন, পাপ্পু ,অভী।

কপালজোরে আমার নিজেরও ছিল বি-পজিটিভ গ্রুপের রক্ত। আমরা পাঁচ বন্ধু প্রবোধবাবুর পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাস ধরে বর্ধমান শহরের বাইরের দিকে একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে যখন ঢুকলাম তখন রাত দুপুর। ভেতরে ঢুকে বুঝলাম, ওটা অ্যাবরশন করার গোপন আস্তানা। বিপত্নীক প্রবোধবাবু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, পুরুষমানুষ হওয়ার কারণে তিনি অনেকদিন অবধি কিছুই বুঝতে পারেননি। যখন বুঝলেন তখনই এখানে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এরা যে কী করেছে, অসম্ভব রক্ত বেরোচ্ছে কেয়ার শরীর থেকে।

আমিই প্রথম ঢুকেছিলাম রক্ত দেওয়ার জন্যে। সাদা চাদরে ঢাকা কেয়ার শরীরটা অসম্ভব সরু লাগছিল। কিন্তু সেই শরীর তখন আর রক্ত নেওয়ার মতন অবস্থায় ছিল না। ও ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল। আমাকে অ্যাবরশন-স্পেশালিস্ট হাতুড়ে ডাক্তার বলল, বাইরে গিয়ে বসো। আর রক্ত দিয়ে লাভ নেই।

আমি বললাম, শুয়োরের বাচ্চা। মেয়েটাকে মেরে ফেললি? লোকটা মুখ ভেঙিয়ে বলল, এত দেরি করে এলে কী করব? ছ'মাসের ফিটাসকে বার করতে গেলে এসব রিস্ক থাকবেই।

বেরিয়েই আসছিলাম। হঠাৎ কেয়ার দিকে চোখ পড়ল। ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এই প্রথম আমি ওর চোখ দেখলাম। কিন্তু সে কী চোখ! কোনো মানুষের চোখ ওরকম হয়? পরিষ্কার দেখলাম, ওর চোখের মণিদুটো লুডোর ঘুটির মতন লাল। আমার দিকে তাকিয়ে কেয়া ফিসফিস করে বলল, অমুদা, রক্ত দাও। রক্ত দাও না! আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করছে অমুদা। তার পরেই ওর চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে নেমে এল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের বললাম, চল। আর কিছু করার নেই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেলাম পাপিয়ার ডাক। বাতাসে হাসনুহানার মাতাল-করা গন্ধ। এই সবকিছুকেই মনে হল খুব দক্ষ শিকারির হাতে সাজিয়ে রাখা একটা ফাঁদ, যে ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল কেয়া নামের

হাতকাটা মেয়েটা।

কেয়া কি সেই রাতেই মারা গিয়েছিল? জানি না। মারা গেলেও কোথায় কারা ওর সৎকার করল? আমরা পাড়ার ছেলেরা কিছুই জানলাম না কেন?

দুদিন পরে প্রবোধবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, বাড়ি ফাঁকা। বাড়িওলা তারকজ্যাঠামশাই হাঁকডাক করে মেঝে সাফ করাচ্ছেন। পরের ভাড়াটে ঢুকবে, তার প্রস্তুতি আর কি। খুবই অবাক হয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি প্রবোধবাবু সব গুটিয়ে ফেললেন কীভাবে?

চার

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, অমলেন্দুদা, এসব তো ভয়ঙ্কর ডিপ্রেসিং ব্যাপার। কেন এইসব পুরোনো স্মৃতি ঘাঁটাঘাঁটি করেন?

উনি বললেন, কী বলছ তুমি? ওই কেয়া, ওই মুসাফিরের গলি আর ভাঙা লেটার-বক্স—এই তিনটে ফ্যাক্টর মিলেই তো আমার জীবনটা বরবাদ করে দিল। ভাবব না এদের কথা!

আমি অবাক হয়ে বললাম, লেটার-বক্স আবার এলো কোথা থেকে?

কোথাও থেকে আসেনি। ওখানেই ছিল। ওই মুসাফিরের গলির মধ্যে।

গলিটার মাঝামাঝি একটা বাঁকের মুখে ওই পুরোনো ভাঙাচোরা লেটার-বক্সটাকে জন্ম থেকেই দেখে আসছিলাম। দেয়ালে ঝোলানো ছোট সাইজের লেটার-বক্স নয়, মাটিতে দাঁড় করানো বড় লেটার-বক্স, যেটার মাথাটা প্রায় আমার কাঁধের কাছাকাছি পৌঁছোয়। কোন বুদ্ধিতে কবে ওটাকে ওখানে বসানো হয়েছিল কে জানে! ওই গলিতে কে চিঠি ফেলতে আসবে? বাক্সটা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল।

কেয়া মারা যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন মুসাফিরের গলিতে যাওয়া হয়নি। দিন পনেরো বাদে হঠাৎ-ই কী মনে হতে ওখানে গেলাম। গিয়ে দেখি ভারি অদ্ভুত এক দৃশ্য। লেটার-বক্সটার রূপ বদলে গেছে। একটা তেলাকুচোর সতেজ লতা বাক্সটার গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে, তাই ওটাকে এখন ঘিরে রেখেছে বরফের মতন সাদা ফুল আর জমাট রক্তের মতন লাল ফলের ঝালর। শুধু তাই নয়, গলির ইট-বাঁধানো রাস্তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে কীভাবে যেন গোছা

গোছা ঘাস গজিয়ে উঠে লেটার-বক্সটার কোমর অবধি ঢেকে ফেলেছে। ফলে ওটাকে আর লেটার-বক্স মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল হাওয়াই দ্বীপের এক হুলা-নর্তকী। পল গঁগ্যার পেইন্টিং-এর নায়িকা। তার গলায় আর এলোচুলে ফুলের মালা জড়ানো, কোমরে ঘাসের ঘাঘরা।

ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, তুমি বিশ্বাস করবে না কুশল, আমার প্রবল ইরেকশন হল। মনে হল ওই তেলাকুচো লতার আড়াল সরালেই দেখতে পাব শ্যামল দুই স্তন। ঘাসের আড়াল সরিয়ে হাত বাড়ালেই হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব নরম এক যোনি। কামজ্বরে পুড়তে পুড়তে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

তাতেও কি শান্তি ছিল? সেই লেটার-বক্সটার তন্বী শরীর সারাক্ষণ মাথার ভেতরে ফিসফিস করে বলছিল, আমার ঠান্ডা কোমরে তোমার গরম হাতের তালু রাখো অমল, উলটে দাও ফ্ল্যাপ, দুটো আঙুল ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। চিঠি ফেল...চিঠি ফেল আমার গভীর কন্দরে। একটা ভালোবাসার চিঠির জন্যে কবে থেকে বসে রয়েছি। তোমার কি মায়া হয় না?

কবিতার খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে লিখতে বসলাম জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। কাকে লিখব জানি না, কোন ঠিকানায় পাঠাব জানি না। শুধু এইটুকু জানি লিখতে হবে এবং ওই রমণীয় লেটার-বক্সের মধ্যে ফেলে আসতে হবে।

ঘোরের মধ্যে কী লিখেছিলাম জানি না। খাম ছিল না, ডাকটিকিট ছিল না। খাতার কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে নিয়ে রাত ন'টার সময় আমাদের বাড়ির ছাদে উঠে গেলাম। ছাদের একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে গলির মধ্যে লেটার-বক্সটাকে দেখা যায়। আমি নিশ্চিত হতে গিয়েছিলাম, জায়গাটা ফাঁকা আছে কিনা।

না, ফাঁকা ছিল না। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটাকে চিনতে পারলাম। আমারই বন্ধু, শম্ভু। আমার সঙ্গে কেয়াকে ব্লাড দিতে গেছিল। আমি ছাদ থেকে ঘরে ফিরে এলাম।

সেই রাত্রেই একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা অন্তর আরও তিনবার ছাদে গেলাম। প্রত্যেকবারই দেখলাম লেটার-বক্সের সামনে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ তখন গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়। তখন অনেক রাত। পাগলা কুকুর, বিষাক্ত পোকা, খুনি, উন্মাদ, বেশ্যা—এদের রাস্তায় নেমে আসার সময় তখন। তবুও ওরা ওই অত রাতে চিঠি ফেলতে গিয়েছিল।

ওদের প্রত্যেককে চিনতে পেরেছিলাম। আমার অনেকদিনের বন্ধু যে ওরা।

রতন, বাপ্পা, অন্তী। মনে আছে তো কুশল, এই তিনটে নাম? শম্ভুর মতন ওরাও সেদিন কেয়াকে ব্লাড দিতে গিয়েছিল।

ওরা প্রত্যেকেই চিঠি ফেলেছিল, তারপর এক এক করে ফিরে গিয়েছিল। কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হয়নি।

ওরা চারজন ফিরে যাওয়ার পর আমি গেলাম। তখন ভোর হয়ে এসেছে। ভোরের হিমে তেলাকুচোর লতা পাতা ফুল সব কিছুই কেমন যেন ভিজে গিয়েছিল। ভিজে ফুল থেকে যে এমন মাংসল গন্ধ ছাড়ে তা আমি আগে জানতাম না। আমি লতার আড়াল সরিয়ে, ফ্ল্যাপ-টাকে বাঁ হাত দিয়ে ওপরে তুলে, আমার চিঠি-সমেত ডানহাতটা লেটার-বক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাল তাল উষ্ণ, কোমল, পিচ্ছিল মাংস আমার হাতটাকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরল। আমার সমস্ত স্নায়ু বেয়ে আগুনের হলকা দৌড়চ্ছিল। প্রতিটি পেশী মাছবাজারের খোবলানো কচ্ছপের মাংসপিণ্ডের মতন থরথর করে কাঁপছিল। কতক্ষণ ওইভাবে কেটেছিল জানি না, হঠাৎ একটা অর্গ্যাজমিক বিস্ফোরণে আমার হাতের মুঠো আলগা হয়ে চিঠিটা খসে পড়ল লেটার-বক্সের মধ্যে।

তৃপ্তির অবসাদে তখন আমি ক্লান্ত। হাতটা বার করে আনতে-আনতে দেখলাম, লেটার-বক্সের অন্ধকার পেটের মধ্যে থেকে দুটো চোখের তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লুডোর ঘুঁটির মতন লাল দুটো চোখের তারা। আমি বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে খুব খানিক হাসলাম। সত্যি, আগেই বোঝা উচিত ছিল। অত সরু লেটার বক্সের মধ্যে খুব সরু একটা মেয়ে ছাড়া আর কে ঢুকতে পারে? যার কাঁধের দু-দিকে হাত নেই, সেইতো শুধু লেটার-বক্সের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে, তাই না?

এই অবধি বলে অমলেন্দুদা চুপ করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর ধৈর্য রাখতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, তারপর?

তারপর আর কী? দিনের পর দিন কেয়া ওইভাবে আমাদের দিয়ে প্রেমপত্র লিখিয়ে নিত, তারপর সেই চিঠি ফেলতে গেলে আমাদের কব্জির শিরা থেকে রক্ত চুষে খেয়ে নিত। এইভাবে একইসঙ্গে ওর ভালোবাসার তৃষ্ণা আর রক্তের তৃষ্ণা, দুটো তৃষ্ণাই মিটে যেত। কিন্তু আমরা পাঁচজন মরে গেলাম। আমরা

ভ্যাম্পায়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কেউ বুঝতে পারে না অবশ্য। তুমি আমাকে একজন জ্যান্ত কবি হিসেবে দেখতে চাইছিলে, তাই তোমাকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

প্লাটফর্মের শেষ মাথায় সিগনালের আলো কিছুক্ষণ আগেই লাল থেকে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। এবার এগিয়ে আসা ট্রেনের ভোঁ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তখনই দেখতে পেলাম চারজন বৃদ্ধকে। কখন যে ওনারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পারিনি। চারজনকেই অমলেন্দুদার মতন দেখতে। ওইরকমই রোগা, মাথাভর্তি পাকা চুল। পরনে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি আর চাদর। অমলেন্দুদার পাশে বেঞ্চিতে এসে ওরা বসলেন। অমলেন্দুদা একটু হেসে আমাকে বললেন, এদের কথাই বলছিলাম। এরাই হচ্ছে শম্ভু, পাপ্পু, রতন আর অভী। আমার অনেকদিনের বন্ধু।

আমি ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন একবার গলসী স্টেশনের প্লাটফর্মের দিকে তাকালাম। আবছা অন্ধকারের মধ্যে থেকে পাঁচটা হাত বাড়া হয়ে উঠে আমাকে বিদায় জানাল। পাঁচটা ডানহাত—রোগা, সাদা, রক্তহীন।
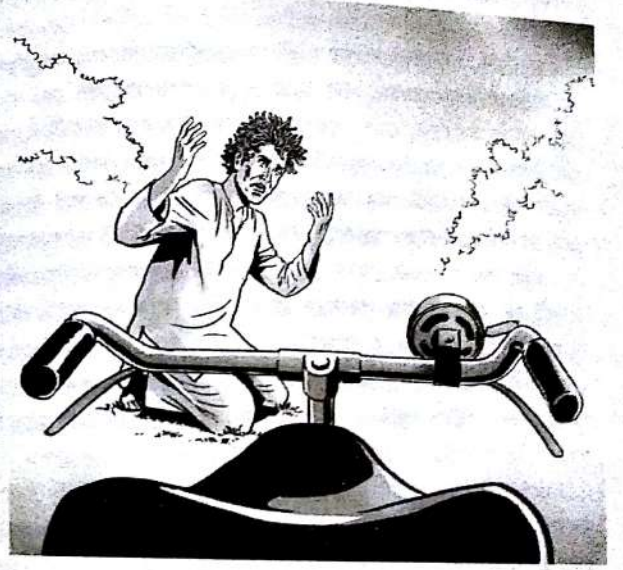
তুলোবীজ

চৈত্রের এই দুপুরে বালুডাঙা শহরের আকাশে-বাতাসে প্রসন্নতা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রসন্নতা ছড়িয়ে আছে শঙ্খদের বাড়ির পেছনের বাগানে। একটা টুনটুনি শিউলিগাছের এক পাতা থেকে অন্য পাতায় লাফ দিয়ে দিয়ে ঘুরছিল আর ক্রমাগত টুইটুই করে ডাকাডাকি করছিল। এইমাত্র সেটা উড়ে গেল সোমাদের বাড়ির দিকে। এখন বাগান প্রায় নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ শঙ্খদের পুরো পাড়াটাই। শুধু সোমার ঠাকুমা রেডিয়োতে 'বোরোলিনের সংসার' চালিয়েছেন, তার আবছা শব্দ ভেসে আসছে।

শঙ্খ বাগানের লাগোয়া রোয়াকের থামে হেলান দিয়ে বসেছিল। হাতে সেইনাসের উল্টোরথ পত্রিকাটা ধরা ছিল ঠিকই, কিন্তু সে কিছুই পড়ছিল

না। সে সোমার কথা ভাবছিল। ভাবছিল সোমা তাকে ভালোবাসে না। কেনই বা বাসবে?

সে নিজের অজান্তেই একবার হাতটা মাথায় বুলিয়ে আনল। বালুডাঙার কুয়ো কিম্বা টিউবওয়েলের জলে আয়রন খুব বেশি। লোকের চুল পড়ে যায়—কারুর কম কারুর বেশি। শঙ্খর যেমন এই একুশ বছর বয়সেই অর্ধেক চুল ফাঁকা হয়ে গেছে। ওর মা ক'দিন ধরে শোয়ার আগে মাথায় ভৃঙ্গরাজ তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি। সে তাই ইদানীং চরম হতাশায় ডুবে আছে। শঙ্খ জানে, সোমা তাকে কোনোদিনই ভালোবাসবে না। একুশ বছরের একটা টেকো ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে না।

ওই তো...সোমা চানের পর ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। ফটাশ ফটাশ করে গামছা দিয়ে ভিজে চুল ঝেড়ে, গামছাটা তারে মেলে দিয়ে, ছাদ থেকে চলেও গেল একটু বাদে। যাবার আগে একবার কি আড়চোখে শঙ্খর দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটা? তাচ্ছিল্য মাখানো ছিল কি সেই তাকানোর মধ্যে? শঙ্খর মনে হল, ছিল।

শঙ্খ ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শুধু সোমাকে একপলক দেখার জন্যেই তার এইসময় পেছনের রোয়াকে এসে বসে থাকা। সোমা চলে গেছে। তারও আর এখানে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।

ঠিক এই সময়েই ক্রিং ক্রিং করে বাড়ির সদর দরজার সামনে সাইকেলের বেল বেজে উঠল। শঙ্খ একরকম দৌড়িয়েই বৈঠকখানা পেরিয়ে সামনের রাস্তায় পৌঁছে গেল। যাবার আগে কলেজের ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকাও বার করে নিতে ভুলল না।

পোস্টম্যান ভদ্রলোক ততক্ষণে সাইকেল থেকে নেমে পড়েছেন। তিনি মুখ নামিয়ে খাকি কাপড়ের ব্যাগটার ভেতরে কী যেন খুঁজছিলেন। শঙ্খ তার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, এনেছেন?

মুখ তুলে অল্প হাসলেন নতুন পোস্টম্যান, অবশ্যই। আমি তোমাকে জিনিসটার কথা বললাম, আর আমিই ভুলে যাব?

শঙ্খ একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, না, তা নয়। মানে জিনিসটা পেয়েছেন কিনা সেটাই জিগ্যেস করছিলাম।

এই পোস্টম্যানের বয়স কম। লম্বা, ফরসা এবং রোগা। আগের জন ছিলেন মোটা এবং বয়স্ক। তিনি মারা যাওয়ার পর এই ভদ্রলোক পোস্টম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এনাকে বালুডাঙার কেউ চেনে না, আগে দ্যাখেনি। এনার কানের পাতাদুটো খুলির সঙ্গে লেপটানো আর চোখগুলো বড় বড়। কিন্তু ওসব কিছু নয়। নতুন এই পোস্টম্যানের দিকে তাকালে প্রথমেই যা চোখ টেনে নেয় তা হল এনার মাথার চুল। শুধু ঘন নয়; চুলগুলোর রং, জেল্লা সবই অন্যরকম। কারুর মাথায় এরকম চুল আগে কখনো দেখেনি শঙ্খ। তিনদিন আগে যখন সে এই নতুন পোস্টম্যানকে প্রথমবার দেখেছিল, তখনই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—বাঃ। ফ্যানটাসটিক চুল তো আপনার।

উনি একবার শঙ্খর মাথার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার এরকম চুল চাই?

শঙ্খ মুখে কিছু বলেনি। শুধু বিব্রত মুখে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল—না। সে বুঝে গেছে, ওসব স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।

পাঁচটা টাকা খরচ করতে পারবে? তোমাকে আমি একটা জিনিস এনে দেব। আমিই তোমার হয়ে অর্ডার দিয়ে দেব, ভিপিতে মাল চলে আসবে। বিশ্বাস করবে, আমারও একসময় তোমার মতন টাক পড়ে গিয়েছিল? তারপর ওই জিনিসটার কল্যাণে...। পোস্টম্যান একবার নিজের ঠাসা চুলগুলোর মধ্যে হাতটা চালিয়ে, শঙ্খর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের আশায়।

শঙ্খ একটু ভেবে নিয়ে রাজি হয়ে গেল। ভৃঙ্গরাজের পয়সা মা দিয়েছেন। এই পাঁচটাকা নাহয় সে নিজের জমানো হাতখরচ থেকেই দেবে। বলা কী যায়, কিসের মধ্যে কোন ম্যাজিক লুকিয়ে থাকে?

সেদিনের সেই কথার সূত্র ধরেই আজ উনি শঙ্খর হাতে একটা মোটা বইয়ের মাপের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। পাতলা পিজবোর্ডের তৈরি ক্যাটকেটে সবুজ রঙের প্যাকেটটা দেখে মোটেই ভক্তি হল না শঙ্খর। পোস্টম্যান বোধহয় মন পড়তে পারেন। বললেন, নতুন কোম্পানি, তাই প্যাকেট-বাইরের চমক, ওসব বানিয়ে উঠতে পারেনি। তবে ওসব কিছু নয়, ভেতরের জিনিসটা পৃথিবীতে এই প্রথমবারের জন্যে এল।

শঙ্খ প্যাকেটটা চোখের সামনে এনে জিগ্যেস করল, কী আছে ভেতরে? লোশন না ক্রিম?

পোস্টম্যান বললেন, ওসব কিছু না। একটা পাতলা প্লাস্টিকের তৈরি টুপির মতন জিনিস আছে। ওটা শোয়ার সময় মাথায় পরে নেবে, সকালে উঠে খুলে ফেলবে।

শঙ্খ আকাশ থেকে পড়ল। বলল, টুপি! টুপি পরে শুতে হবে! কদিন পরতে হবে?

একদিন। একদিন, মানে একটা রাত আর কি। অধৈর্য গলায় বললেন পোস্টম্যান।

তারপর শঙ্খর হাত থেকে নোটটা নিয়ে বললেন, শোনো ভাই, একটা কথা বলে দিই। টুপিটা পরার পর প্রথমটায় একটু চিনচিন করতে পারে। ভেতরে মাইক্রোস্কপিক নিডলস আছে। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে স্কিনের নীচে জিনিসটা ঢুকে যায় তো, তাই। তবে একটু বাদেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। আর কিছু টের পাবে না।

শঙ্খ ইতস্তত করে বলল, বাবা! ভয় লাগছে তো শুনে। ঘা-টা হয়ে যাবে না তো?

পোস্টম্যান মুচকি হেসে বললেন, আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু না। ওসব কিছু হবে না। শুধু...।

শুধু কী?

তোমার জীবনটা বদলে যাবে।

শঙ্খর কানে এই শেষের কথাটা কেমন যেন শোনাল। সে পোস্টম্যানের মুখের দিকে তাকাল। শুধু চুল নয়, ওনার চোখদুটোও একটু অন্যরকম। মণির পেছনে যেন সরু সরু কিসের কিলবিলানি। শঙ্খ নিজে রোজ বাড়ির অ্যাকোরিয়ামের মাছেদের জন্যে একটা কাচের বাল্‌বের মধ্যে চিমটে দিয়ে ধরে ছোট্ট এক দলা কেঁচো রেখে দেয়। লোকটার চোখের মণি দেখে সেই কেঁচো-ভর্তি বাল্‌বটার কথা মনে পড়ে গেল শঙ্খর। সে পোস্টম্যানের হাত থেকে প্যাকেটটা নিল। তারপর আর কোনো কথা না বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

পাঁচটা টাকা খরচ করতে পারবেন? এইরকম চুল আপনারও হবে।

শঙ্খর কথা শুনে ডক্টর শাসমলের বউ মন্দিরার চোখদুটো লোভে চকচক করে উঠল। শঙ্খকে তিনি চেনেন। ছেলেটা ভালো গিটার বাজায়। তার গানের সঙ্গেও দু-একটা ফাংশানে বাজিয়েছে। দু-মাস আগেও ছেলেটার মাথায় টাক ছিল। অথচ এখন মাথাভর্তি ঘন চুল। আর সে কী চুল। বুড়ো-আরশোলার ডানার মতন কালচে লাল রং। শুয়োরের ঘাড়ের রোঁয়ার মতন ঠাসা।

মন্দিরা বললেন, সত্যিকথা বল তো ভাই। উইগ পরিসনি তো?

ছুঁয়ে দেখুন। দেখুন না। শঙ্খ মাথাটা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল।

এই বয়সের ছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত নয় জেনেও মন্দিরা নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সদর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি ডানহাতের আঙুলগুলো শঙ্খর চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

তিনি বরের কাছে শুনেছিলেন, মানুষের চুল আসলে মৃত কোষ। কিন্তু কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। এই যে শঙ্খর চুলগুলো তার আঙুলগুলোকে জড়িয়ে ধরছে, আদর করছে—এ কি কোনো মৃত কোষের পক্ষে সম্ভব? চুলের গায়ে কি এত তাপ থাকে? দপদপ করে? কাঁপে? মন্দিরার মনে হল শঙ্খর মাথার প্রত্যেকটা চুল যেন জীবন্ত। কাটলে রক্ত বেরোবে।

তিনি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, কী লাগিয়েছিলিস রে? কোনো লোশন? নাকি তেল?

না, ওসব কিছু নয়। একটা টুপি...এক রাত, মাত্র এক রাত পরে শুতে হবে। আমার কাছেই রয়েছে। যদি নিতে চান...।

মন্দিরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, একটু দাঁড়া। আমি টাকাটা নিয়ে আসছি।

মন্দিরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। শঙ্খ কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে ভেতর থেকে সবুজ প্যাকেটটা বার করতে গেল। প্যাকেটের সঙ্গে একটা ভাঁজ করা কাগজ বেরিয়ে এল। এটা কী?

শঙ্খ কাগজটার ভাঁজ খুলে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে

রইল। মনে হচ্ছে একটা চিঠি। শুরুতেই মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে 'প্রিয়তম'। কথাটার মানে কী? শেষে লেখা 'তোমার সোমা'। মানে কী? সোমা নামে একটা মেয়ের কথা আবছা মনে পড়ছে ঠিকই। কিন্তু তার তো এমনিতেই মাথাভর্তি চুল। তার সঙ্গে তো শঙ্খর কোনো লেনদেন থাকবার কথা নয়।

ক্রিং ক্রিং। সাইকেলের বেলের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল শঙ্খ। রাস্তার ওপাশে পোস্টম্যান দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাকে ইশারায় কাছে ডাকছেন।

শঙ্খ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পোস্টম্যান ঠান্ডা হিম গলায় বললেন, তোমাকে বলেছিলাম না, মেয়েদের হাতে এ জিনিস দিও না।

কেন? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল শঙ্খ। কত কষ্ট করে সে একজন খরিদ্দার জোগাড় করেছিল। শুধু মহিলা বলে তাকে হাতছাড়া করতে হবে?

পোস্টম্যান একইরকম ঠান্ডাগলায় উত্তর দিলেন—মেয়েদের শরীরের ভেতরে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায়। উনি তো বিবাহিত। ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরো প্রবল। চলো। পালিয়ে চলো এখান থেকে। আমার সাইকেলে উঠে বসো।

সেই আদেশ উপেক্ষা করতে পারল না শঙ্খ। পোস্টম্যানের সাইকেলের সামনের রডে উঠে বসল সে।

পোস্টম্যান সাইকেল থামালেন একেবারে ইটখোলার মাঠে পৌঁছিয়ে তারপর। এখানে চারিদিকে ধুধু জমি। আগের বছরের ইটের পাঁজা দুয়েকটা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে একটা বিরাট জলা।

প্রাকৃতিক জলা নয়। বালুডাঙার একপ্রান্তে মানুষের হাতে তৈরি ওরকম বড় বড় ভেড়ির মধ্যে নদীর জল এনে জমানো হয়। জলের নীচে পলি থিতিয়ে পড়লে সেই পলি দিয়ে তৈরি করা হয় একনম্বর পাগমিল ইট। তবে তার এখনো দেরি আছে। এখন তো সবে আষাঢ়। জল শুকোতে শুকোতে সেই আশ্বিন। তারপরে শীতকালে নতুন ইট তৈরির কাজ শুরু হবে।

আপাতত গভীর ভেড়ির ঘোলা জলে কোটি কোটি বুদবুদ ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মাছ নয়। এই জলায় মাছ থাকে না। অন্য কিছুর নিশ্বাসের বুদবুদ।

একটা ইটের পাঁজার গায়ে সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে রেখে জলার ধারে পা ছড়িয়ে বসালেন পোস্টম্যান। শঙ্খও তার পাশে গিয়ে বসল।

পোস্টম্যান বললেন, কী সুন্দর এই পৃথিবী। তাই না শঙ্খ?

শঙ্খ বলল, হ্যাঁ। খুব সুন্দর।

অথচ দেখো, মানুষ ভাবে এই পৃথিবী তার একার। আর কাউকে আসতেও দেবে না, থাকতেও দেবে না। মেরে সাফ করে দেবে। কিন্তু চিরকাল তো এরকম ছিল না।

ছিল না? সম্মোহিতের মতন প্রশ্ন করে শঙ্খ?

না। কোথায় ছিল? তুমি মাইটোকনড্রিয়ার কথা জানো?

মাইটোকনড্রিয়া? শব্দটা চেনা লাগল শঙ্খর।

পোস্টম্যান কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, মনে পড়ছে না? আমাদের কোষের মধ্যে যে মাইক্রোস্কোপিক বডিগুলো থাকে? 'পাওয়ারহাউস অব দা সেল' বলা হয় যাদের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।

ওরা তো অনেক-বছর আগে বাইরে থেকে এসেই মানুষের শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। এখনো ওরা মানুষের কোষের মধ্যে নিজেদের মতন করে সেল ডিভিশন করে চলেছে। ওদের ক্রোমোজোমের সঙ্গে মানুষের শরীরের অন্য কোনো কোষের ডি এন এ স্ট্রাকচার মেলেনা জানো তো?

জানতাম না। 'বাইরে থেকে এসে' মানে কী?

পৃথিবীর বাইরে থেকে এসে। তাতে কি কোনো ক্ষতি হয়েছে মানুষের?

শঙ্খ কোনো উত্তর দিল না। সে আজকাল পরিষ্কার করে কিছুই ভাবতে পারে না। মাথার মধ্যে সারাক্ষণ অন্য কারা যেন কথা বলে, গান গায়। কারা যেন বলে, 'চলো, চলো। ছড়িয়ে পড়ি। কী সুন্দর এই নীল গ্রহ। কী সুন্দর এই 'জল' নামের তরল। চলো, জলে নামি।

শঙ্খ পোস্টম্যানকে জিগ্যেস করল—আচ্ছা, আপনার আগে যিনি পোস্টম্যান ছিলেন, হরিপদবাবু, তিনি এই জলাটাতেই ভাসছিলেন না?

হ্যাঁ। হরিপদবাবু জলে ডুবে মরলেন বলেই তো আমি চাকরিটা পেলাম।

আপনিও কি একদিন মরে যাবেন? জলে ডুবেই মরবেন কি?

পোস্টম্যানের মাথার চুলগুলো হঠাৎ যেন ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

সে অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সবকিছু। উনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, যদি তেমন কিছু ঘটে, তাকে মৃত্যু বোলো না। মৃত্যু বলে কিছু নেই। আছে শুধু রূপান্তর।

তারপর পোস্টম্যান তার কাঁধের ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা ছোট ডায়েরি বার করে শঙ্খকে বললেন, তুমি যাদের মাল বেচেছ তাদের নাম ঠিকানাগুলো বলে যাও। লিখে নিই।

শঙ্খ দেখল ওনার কানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে হঠাৎ কিলবিল করে কয়েকটা চুল বেরিয়ে এসে অস্থিরভাবে নড়াচড়া শুরু করল। একটু বাদে আবার শামুকের শুঁড়ের মতন তারা ঢুকেও গেল যথাস্থানে। এর মানে কী শঙ্খ ঠিক বুঝতে পারল না। এরকম কি হয়? এরকম হওয়াটা কি স্বাভাবিক? কে জানে?

সে আর ওসব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে, ব্যাগ থেকে একটা চারনম্বর বঙ্গলিপি খাতা বার করল। বলল, লিখে নিন। চড়কডাঙার দর্পণ দত্ত। লিচুবাগানের আয়ুব মণ্ডল। চণ্ডীতলার পঙ্কজ সাধুখাঁ।

পঙ্কজ সাধুখাঁ! চণ্ডীতলায় যার চালের আড়ত আছে? আর্তনাদ করে উঠলেন পোস্টম্যান। শঙ্খ খেয়াল করল, বুদবুদগুলো হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ভেড়ির জল হয়ে উঠল সীসের পাতের মতন ভারী আর মসৃণ। যেন প্রচণ্ড উত্তেজনায় সেই জল নিশ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে শঙ্খ কী বলে শোনার জন্যে।

পোস্টম্যান আবার প্রশ্ন করলেন, ওনাকে তুমি এই টুপি বিক্রি করেছ?

শঙ্খ একগুঁয়ের মতন জবাব দিল, তাতে কী হল? উনি তো মহিলা নন।

পোস্টম্যান তিতিবিরক্ত গলায় বললেন, না, মহিলা নন। শ্রেণীশত্রু। আড়তদার। জানো না, হিটলিস্টে ওনার নাম আছে? কতদিন আগে বিক্রি করেছিলে?

অনেকদিন। তা দু'মাস তো হবেই। আমতা আমতা করে উত্তর দিল শঙ্খ। উনি নিজেই আমাকে ডেকে হাতেপায়ে ধরে আমার নতুন চুলের গোপন রহস্য পেট থেকে বার করে নিলেন। বিশ্বাস করুন, আমি টুপি বিক্রি করতে চাইনি। কিন্তু উনি বললেন, ওনার মাথাজোড়া টাকের জন্যে এক ক্যাবারে ড্যান্সার ওনাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। শেষ অবধি রাজি হতেই হল।

কিন্তু আবারও বলছি, তাতে কোন ক্ষতিটা হয়েছে?

এমন কোনো শরীরে আমরা ঢুকতে চাই না যেখানে অন্য কিছু ঢোকার সম্ভবনা রয়েছে। সে পেনিস-ই হোক কিম্বা ছুরি। তোমাকে তো সবকিছুই বুঝিয়ে বলেছিলাম।

শঙ্খ অবাক হয়ে শুনল, পোস্টম্যানের মুখ থেকে নয়, কথাগুলো আসছে তার নিজের মাথার ভেতর থেকে।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের মতন আওয়াজের সঙ্গে ভেড়ির স্থির জলতল বুদবুদের তোড়ে লাফিয়ে উঠল।

স্যার! স্যার!

পাগলা পার্থ দৌড়ে এসে ডক্টর শাসমলের রাস্তা আগলে দাঁড়াল।

পার্থ ব্যানার্জি ডাক্তার শাসমলের প্রতিবেশী। খুব বনেদি বাড়ির ছেলে। বদ্ধ পাগল নয়; যাকে বলে ছিটগ্রস্ত, তাই। পার্থ সায়েন্স ফিকশনের পোকা। ডাক্তার শাসমলের ধারণা ওই আজগুবি গল্পগুলো পড়েই ওর মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে একমাত্র মন্দিরা আর ডাক্তার শাসমলই ওকে একটু প্রশ্রয় দেন। তাই ওর গ্রহান্তরের জীব নিয়ে উদ্ভট সব আইডিয়াগুলোও ওদের দুজনকেই গিলতে হয়।

মাসকাবারি রিকশাওলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে যাবেন বলে রিকশায় উঠতে যাচ্ছিলেন। অন্য কেউ হলে এইসময়ে পার্থর পাগলামি দেখে খেপে যেত। কিন্তু ডাক্তার প্রাণবিন্দু শাসমলের মনটা মায়ায় ভরা। তিনি পার্থর কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন, কী হল? আজ আবার কী প্রবলেম?

আমাদের বালুডাঙায় স্যার দুটো সেলুন—একটা ব্রজেনদার কেশশ্রী, অন্যটা ভূতনাথের কেশকলা। দুটো সেলুনে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, মোট তিয়াত্তরজন লোক চুল কাটা ছেড়ে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু রিকশার পাদানিতে একটা পা তুলে বললেন, সেটার মধ্যে কোনো রহস্য নেই। ওরা নিশ্চয় অন্য কোনো শহরের সেলুন থেকে চুল কাটিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা তা নয় স্যার। আমি ওয়াচ করে দেখেছি, ওদের চুল নাড়ে না। ওই যাদের টাকে নতুন করে চুল গজিয়েছে।

মে বি দোজ আর নট রিয়েল হেয়ার। মে বি সিনথেটিক ইমপ্ল্যান্টস। যাই হোক, ওসব নিয়ে বেশি ভেব না।

ভাবতে বারণ করলেন ঠিকই, কিন্তু পার্থর মাথা থেকে তবু ভাবনা যাচ্ছিল না। পাঁচ টাকায় সিন্থেটিক ইমপ্ল্যান্টস। সে কি হতে পারে? হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়তে সে আবার ঘুরে এল। বলল, আরেকটা কথা স্যার। আমরা ভাবি আকাশ থেকে শিমুলগাছ নেমে আসবে...

ভাবি নাকি? চরম ব্যস্ততার মধ্যেও পার্থর কথা শুনে হেসে ফেললেন ডক্টর শাসমল।

পার্থ অধৈর্য স্বরে বলল, ওঃ, আই ওয়াজ সিম্পলি ইউজিং আ মেটাফোর। আমরা ভাবি আকাশ থেকে বিশাল ফ্লাইং সসার নেমে আসবে। রে-গান নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এলিয়্যানস এসে মানুষকে শেষ করে দেবে। কিন্তু স্যার, কখনো ভেবে দেখেছেন কি, আকাশ থেকে তো শিমুল গাছ নেমে আসে না। যা আসে তা হল শিমুলের বীজ। ছোট ছোট উড়ন্ত তুলোর টুকরোয় চেপে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তো গাছ। তারপর তো মহীরুহ।

ডক্টর শাসমল রিকশাওলাকে রওনা হওয়ার ইশারা করলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে পার্থ। বাকি কথা পড়ে শুনব।

পার্থ পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, স্যার, আমি কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বিপদের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন স্যার।

থাকব থাকব। চলে যেতে যেতে হাত তুলে বললেন ডাক্তার শাসমল। তার মনটা দমে গেল। পাগলরা নাকি অনেক কিছুর পূর্বাভাস পায়। পার্থ তাকে সাবধানে থাকতে বলল কেন?

মুন্সীবাড়ির গলির মধ্যে দিয়ে ডাক্তারবাবুর রিকশা যাচ্ছিল। তারপর ব্যানার্জিপাড়ার রাস্তা। তারপর আবার চকবাজার বাইলেন। ডাক্তারবাবু বিরসমুখে দেখছিলেন প্রত্যেকটা গলি, প্রত্যেকটা ছোট রাস্তার দেয়াল ভরে উঠেছে শ্লোগানে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। শ্রেণীশত্রু নিপাত যাক।

বালুডাঙার আকাশে চৈত্রমাসে যে প্রসন্নতা ছড়িয়ে ছিল, সেই প্রসন্নতা এই আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে। এখন রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় পেটোর আওয়াজে। গত সপ্তাহে ওরা মহাকালি বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলিদির গলায় ছুরি ধরে কোশ্চেনপেপার লুঠ করে নিয়ে গেছে। কী হচ্ছে কী এসব?

এখন প্রায় প্রতিরাতেই এখানে ওখানে এক দুটো লাশ পড়ে। পরের দিন দুপুরে সেই লাশ পৌঁছে যায় হাসপাতালের মর্গে। রাউন্ড সেরে সন্ধের দিকে ডক্টর শাসমল ইনকোয়েস্ট শুরু করেন।

ইনকোয়েস্টের আর আছেটা কি? সেই স্ট্যাবড টু ডেথ। ইনজুরি ওয়াজ কজড বাই সাম শার্প ওয়েপন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু। ডাক্তারদের ইনকোয়েস্ট ওপর-ওপর এইটুকুই বলতে পারে। মৃত্যুর যথার্থ কারণ বলতে পারবেন পলিটিশিয়ানরা। ছুরির হাতল ধরে থাকে যে হাতগুলো, সেই হাতের পেছনে বিষিয়ে ওঠা মনগুলোকে শনাক্ত করা কোনো ডাক্তারের কম্ম নয়।

সন্ধেবেলায় রাউন্ড সেরে বেরিয়ে ডক্টর শাসমল দেখলেন বারান্দার নীচে বাসু ডোম দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, কী রে বাসু? আজকেও?

বাসু চুল্লুজড়ানো গলায় বলল, হ্যাঁ, স্যার। একটাই বডি রয়েছে। আমি চিরে দিয়ে এসেছি। আপনি দেখে নিলে সেলাই করে দেব। আমি স্যার একটু ঘুরে আসছি। আধঘন্টার মধ্যে চলে আসব।

ডক্টর শাসমল ঘাড় নেড়ে বাসুকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এটা বাসুর নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। এই আধঘন্টায় ও মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে দরাদরি সেরে আসবে। ডেডবডি ঠিকঠাক বানিয়ে তাদের হাতে তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়ার মূল্য বুঝে নেবে। এসব ওপেন সিক্রেট। সরকারি হাসপাতালে এসব সিক্রেটের দিকে তাকাতে নেই।

ডক্টর শাসমল একাই মর্গের দিকে রওনা দিলেন। হাসপাতাল বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে, একটা বড় ডোবার পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মর্গটা। সামনের দিকে দরজা। পেছনের দিকে দেয়ালের একটু ওপরদিকে একটা গরাদ লাগানো জানলা। ব্যস। একজস্ট ফ্যান নেই, এয়ার কন্ডিশনার নেই। তাই খুব সহজেই ডেডবডি রট করে যায়। নরক হয়ে ওঠে ঘরের ভেতরটা।

ডক্টর শাসমল দরজার সামনে বাইরে থেকে টেনে দেওয়া হুড়কো খুলে ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন। অভ্যেসমতন মাস্কটা পকেট থেকে বার করে নাকের ওপর বেঁধে নিতে গিয়েও থেমে গেলেন। অন্যান্যদিন লাশকাটা ঘরের দরজা পেরোলেই যে দুর্গন্ধটা নাকে ভক করে এসে লাগে সেই গন্ধটা আজ নেই। লাশ আছে তো সত্যিকারে? নাকি বাসু নেশার ঘোরে ভাট বকে গেল?

মাস্কটা ডাক্তারবাবুর হাতেই ধরা থাকল। তিনি সাবধানে বেশ বড় করে একটা শ্বাস টানলেন। পচা গন্ধ নেই ঠিকই, কিন্তু অন্য একটা গন্ধে ঘর ভরে আছে। বেশ চনমনে, চেনা-চেনা একটা গন্ধ। কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়েই তিনি ভাববার চেষ্টা করলেন, গন্ধটা এর আগে কোথায় পেয়েছিলেন।

হঠাৎ-ই মনে পড়ল। গতবছর পুজোয় কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে পহেলগামের তৃণভূমিতে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তিনি আর মন্দিরা। তাদের দুজনকে ঘিরেছিল মাইলের পর মাইল হিমে ভেজা তাজা সবুজ ঘাসজমি আর সেই ঘাসের ওপর শুয়ে-শুয়ে ভেড়া চড়ছিল। ভেড়ার লোমের গন্ধ আর তাজা ঘাসের গন্ধ মিলেমিশে একটা অদ্ভুত প্রাণবন্ত গন্ধে সেদিন পহেলগামের বাতাস ভারী হয়ে ছিল। এই গন্ধটা অনেকটা সেই গন্ধের কাছাকাছি। কোনো অ্যানিমাল ফাইবারের গন্ধ।

ডক্টর শাসমল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ঘরের মাঝখানে লোহার খাটটার কাছে। খাটের ওপরে নামানো আছে সাদা চাদরে ঢাকা ডেডবডি। একপাশে একটা ক্লিপবোর্ডে মৃতের কাগজপত্র। মাথার ওপরে হ্যাজাক ল্যাম্পটার দম কমে এসেছিল। সেই অল্প আলোয় ডক্টর শাসমল কাগজটার ওপর চোখ বোলালেন। তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এলো। মাই গুডনেস। পঙ্কজ সাধুখাঁ! শেষ অবধি ওরা শ্রেণীশত্রুকে হাতে পেল তাহলে?

হাতে গ্লাভস গলিয়ে তিনি আস্তে করে মৃতদেহের ওপর থেকে সাদা চাদরটা সরিয়ে দিলেন। উলঙ্গ দেহটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ডক্টর শাসমলের ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। শেষবার যখন লোকটাকে দেখেছিলেন তখন মাথাজোড়া টাক ছিল। এখন ইবোনি কালারের ঘন চুলে মাথা ভরা। এই লোকটাও তাহলে পার্থর সেই রহস্যময় মানুষের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল?

ডাক্তারবাবুর চোখ সাধুখাঁর মাথা থেকে নেমে এল গলায়। গলার বাঁদিকে প্রায় দু-ইঞ্চি চওড়া একটা জায়গা হাঁ হয়ে রয়েছে। ওইখানেই মরণ-মারটা মেরেছে। স্ট্যাবিং অ্যাজ ইউজুয়াল। আর কী হবে? একটা ছোট স্কেল তুলে নিয়ে ডক্টর শাসমল ক্ষতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর গভীরতার মাপ নিয়ে কাগজে টুকে রাখলেন। এরপর দেহকাণ্ডের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই কাজ শেষ।

বাসু তার চপারের মতন বড় ছুরি দিয়ে গলা থেকে তলপেট অবধি চামড়া আর পেশীর চাদর চিরে দিয়ে চলে গেছে। ডক্টর শাসমল বড় সাঁড়াশিটা তুলে নিলেন। তারপর বুকের পাঁজরগুলো চাড় দিয়ে ওলটাতে শুরু করলেন। নেহাত নিয়ম বলেই ভেতরটা দেখতে হচ্ছে। একবার ছেঁড়া, আর একবার সেলাই করা। পুরো ব্যাপারটাই ফার্স।

ফার্স কি সত্যিই? পঙ্কজ সাধুখাঁর বুকের ভেতর নজর না চালালে কি এই দৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন? এই যে শরীরের পুরো গহ্বর জুড়ে রাশি রাশি জীবন্ত তন্তু কিলবিল করছে, এ কি ফার্স? এই যে, সেই তন্তুগুলোরই ওপরের অংশ মাথার খুলি ফুঁড়ে ওপরে উঠে গেছে, ঘন চুল সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাধুখাঁর খুলির ওপরে, সে-ও কি ফার্স?

ডক্টর শাসমলের চোখের সামনেই এবার সেই জীবন্ত তন্তুগুলো সাধুখাঁর শরীরের খোল থেকে বেরিয়ে সাপের মতন ঢেউখেলানো চালে চলতে শুরু করল জানলাটার দিকে। মনে হচ্ছিল একটা মোটা বিনুনি কোনো রূপসীর মাথা থেকে নেমে নিজের ইচ্ছেয় দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। দেখতে দেখতে কুণ্ডলী পাকানো পোকাগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে ডোবাটার দিকে রওনা হল। ডক্টর শাসমল জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে চলকে পড়া হ্যাজাকের আলোয় ওদের জলযাত্রা দেখতে পাচ্ছিলেন।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতন সেদিকে তাকিয়ে থেকে তারপর তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন সাধুখাঁর ডেডবডির দিকে। এখন সেই ডেডবডির মাথায় আবার পুরোনো টাক ফিরে এসেছে, কিন্তু ফেরেনি তার হার্ট লাং কিডনি লিভার স্টমাক। কসাইখানায় টাঙিয়ে রাখা পেট-চেরা খাসির মতন সাধুখাঁর শরীরের ফাঁকা খোলটা ওই লোহার খাটের ওপর পড়ে রয়েছে।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন, তার মানে অনেকদিন আগেই সাধুখাঁ মারা

গিয়েছিল? তার শরীরটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল এই প্যারাসাইটগুলো! পঙ্কজ সাধুখাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম বলে আশেপাশের মানুষ যাকে ভুল করছিল তা এই অদ্ভুত পোকাগুলোর কথাবার্তা? এদেরই কাজকর্ম?

একদম পিঠের কাছেই আলতো পায়ের শব্দে ডক্টর শাসমলের চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি বিদ্যুতগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন কখন যেন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এসেছে দুটো লোক। দুজনেই তার চেনা। শঙ্খ বলে সেই গিটারিস্ট ছেলেটা আর বালুডাঙার নতুন পোস্টম্যান।

তিনি দেখলেন, শঙ্খর মুখের ভেতর দিয়ে চুলের স্রোত বেরিয়ে হ্যাজাকের আলোটাকে ঘিরে ধরছে। লাশকাটা ঘরটা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন, ওরকমই আরেকটা ঘন বিনুনি পোস্টম্যানের হা করা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তার গলাটাকে পেঁচিয়ে ধরল।

মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে ডক্টর শাসমল পৃথিবীর আকাশে রাশিরাশি তুলোবীজ উড়তে দেখেছিলেন।
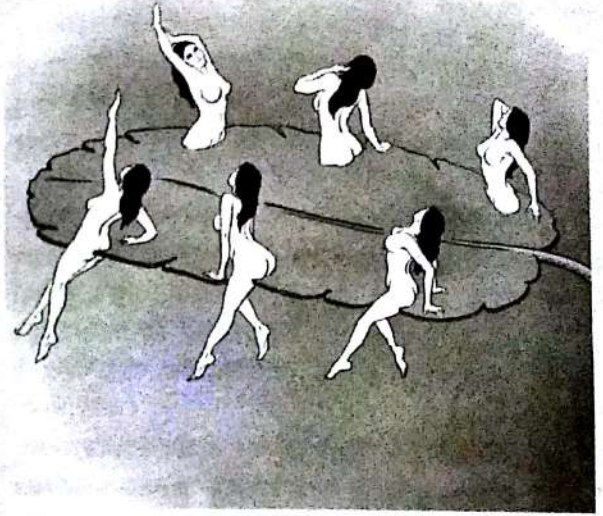
নিভাঁজ ত্রিভুজ

এক

আমার ছোটবেলায় পৌঁছোতে গেলে আজ থেকে পঞ্চাশবছর পিছিয়ে যেতে হবে। তখন এই বোষ্টমডাঙার চেহারাছবি কেমন ছিল তা আজকের বোষ্টমডাঙায় দাঁড়িয়ে কল্পনাও করা যাবে না। তখন কোথায় হাজারে-হাজারে অটো-টোটো, কোথায় বিগ-বাজার আর কোথায়ই বা গুচ্ছের ফ্ল্যাটবাড়ি?

এই শহরের প্রত্যেকটা পাড়ায় তখন অনেকখানি করে ফাঁকা জমি পড়ে ছিল আর সেইসব জমির মধ্যে সদ্য তৈরি হচ্ছিল একটা-দুটো করে একতলা

দোতলা বাড়ি। কাঁচা নর্দমার পাড়ে বর্ষায় নীলকলমি ফুটত। ফাঁকা জমিগুলোয় বিকেলে হাওয়াইচটির গোলপোস্ট বানিয়ে রবারের বল পিটিত ন্যাংলা-প্যাংলা ছেলের দল। ছিল অনেক ডোবা আর পুকুর। বর্ষায় সেইসব পুকুরের উপচানো জলে চুনোমাছ ধরার জন্যে ঘুনি পাতত মালিকপাড়ার বস্তির রোগা মেয়েরা। সন্ধের পর থেকে ল্যাম্পপোস্টের মলিন বাল্বের আলোয় কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে থাকত চরাচর। শাঁখের শব্দ শুনে কাঁঠালবাগানের বিরাট অর্জুনগাছটার মাথা থেকে ডানা মেলে দিত বাদুড়ের ঝাঁক।

আমার পিসির বাড়িটা ছিল অবশ্য অনেক পুরোনো। বোধহয় বোষ্টমডাঙার প্রাচীনতম বাড়ি ছিল সেটা। পিসেমশাই নিত্যানন্দ মজুমদারের বাবা শুদ্ধানন্দ মজুমদারের আমল থেকে ওরা ওই ভাঙাচোরা বাড়িটাতেই বাস করছেন। এই যে বোষ্টমডাঙা নিয়ে এত কথা বলছি, সে-ও ওই পিসির বাড়ির কল্যাণেই। এর মধ্যেও অনেকটাই আবার আমার পিসির শাশুড়ি মেমবরণী দেবীর মুখে শোনা।

ছোটবেলায় যখন গরমের ছুটিতে পিসিমার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, তখনো সে-বাড়িতে সিলিংফ্যান বসেনি। গরমের ঠেলায় অস্থির হয়ে মেমদিদার একতলার ঘরের পাথরের মেঝেয় মাদুরের বিছানায় শুয়ে দুপুর কাটাতাম। ঘরের কোনায় ঠাকুরের আসনের দিক থেকে চন্দন, তুলসী, বাসি ফুল, ভিজে-বাতাসা আর শসাকুচির ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ ভেসে আসত। মেমদিদা পাশে শুয়ে ঝালর লাগানো হাতপাখা দিয়ে আমাকে হাওয়া করত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম দিদার হাতের তালুর উলটো-পিঠের চামড়ার মধ্যে দিয়ে নীল নীল শিরা-উপশিরা দেখা যাচ্ছে। ভীষণ ফর্সা ছিল মেমবরণী মজুমদার—মেমেদের মতনই ফর্সা।

তবে কিনা তখন দিদার বয়স আশি পেরিয়েছে। ভীমরতির বশে বুড়ি কখন কী বলছে, কখন কী করছে, কিছুই ঠিক ছিল না।

সেবার ক্লাস টেনের সামার-ভেকেশনে বোষ্টমডাঙায় গিয়ে দেখি, পিসিমা চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র করছেন আর পিসেমশাই 'চুপ চুপ' বলে তাকে থামাবার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কী ব্যাপার? না, মেমদিদা পাশের পাড়ার

চিন্তামুদির হাতে আফিং কেনার পয়সা দিতে গিয়ে ভীমরতির ঘোরে সিন্দুকে রাখা ভিক্টোরিয়ার মোহর তুলে দিয়েছে, যদিও চিন্তামনি সাহা জেরার মুখে বিলকুল সব অস্বীকার করে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ভীমরতির ওপরে বুড়ির আফিং-এর নেশাও ছিল। দুইয়ে মিলে তাকে বানিয়ে তুলেছিল মহা কল্পনাপ্রবণ এক জীব। দিদা আমার পাশে শুয়ে নিজের মনেই যেসব গল্প বলে চলত, সেগুলোর মধ্যে দিয়েই আমার মতন এক বালকের চোখের সামনে প্রথম অন্ধকার পৃথিবীর আগল খুলে গিয়েছিল। কিম্বা বলা যায়—নরকের দরজার তালা। শিশু-মনস্তত্বের ধার ধারত না মেমদিদা। অবশ্য ক্লাস টেনে কেউ খুব একটা সরল-সিধে শিশু থাকে না। উপরন্তু আমি যে-স্কুলটায় পড়তাম, সেখানে বস্তির ছেলেপিলেদের সংখ্যাই বেশি ছিল। ফলে গুপ্তজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তাতে আমার তখনই মাস্টারডিগ্রি হয়ে গিয়েছিল।

আমি পাশে শুয়ে সেইসব কথার কিছুটা শুনতাম, কিছুটা গল্পের বইয়ের টানে হারিয়ে ফেলতাম।

তবে সে-প্রসঙ্গে দিদা কথা বলতে শুরু করলেই আমি বুকের ওপরে গোয়েন্দাগল্পের বই ভাঁজ করে রেখে কান খাড়া করে শুনতাম, সেটা হল কুট্টি নামে একটা মেয়ের গল্প। দিদার নিজের মেয়েরই ডাকনাম ছিল কুট্টি। তার যখন আঠেরো বছর বয়স তখন কারা যেন রেপ করেছিল। মেমদিদা 'রেপ' শব্দটার বদলে অত্যন্ত গ্রাম্য এবং স্ল্যাং একটা শব্দ ব্যবহার করত। তবে সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হত না। আগেই বলেছি, নারীপুরুষের শরীর ও সঙ্গম সংক্রান্ত সমস্ত স্ল্যাং-ই তখন আমার ঠোঁটস্থ ছিল।

মেমদিদার ঘরের দেয়ালের দিকে চোখ চলে যেত। জোড়াবিনুনি বাঁধা একটা মেয়ের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কালো ছবি ঝুলত সেই দেয়ালে। তার বাঁ-গালে আঁচিল। ছবিটা ঝুলত মেমদিদার হাতের নাগালেই, যাতে মেমদিদা প্রতিদিন ঠাকুরকে ফুল দেওয়ার সময়েই মেয়ের ছবিতে একটা টাটকা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিতে পারে।

যা বলছিলাম। তার মানে কুট্টি নামে সেই মেয়েটা ছিল আমার পিসেমশাই নিত্যানন্দ মজুমদারের দিদি। এরপর থেকে তাকে কুট্টিপিসি বলে

রেপ্সার করব। পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরের ধানকলের গলি নামে কোন এক অন্ধগলির মধ্যে নাকি একপাল নরপশু কুট্টিপিসিকে রেপ করেছিল।

সেটা কবেকার কথা? মেমদিদার মুখে গল্পটা শুনেছিলাম আজ থেকে পঞ্চাশবছর আগে। তারও প্রায় পঞ্চাশবছর আগের সেই ঘটনা। তার মানে সেই ঘটনার পরে প্রায় একশো বছর কেটে গেছে।

মেমদিদা বলত, মেয়েটা আমার তখন-তখনই মরেনি, বুঝলি গোপাল? মেয়েরা অত সহজে মরে না। যন্ত্রণা পেয়েছিল খুব। শরীরের যন্ত্রণা তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ভয়। রাতে ঘুমোতে পারত না। দিনের বেলাতেও ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে, দেয়ালের কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকত। আমি ছাড়া আর কেউ ঘরের বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করলেই আতঙ্কে চিৎকার করতে শুরু করত। শেষ অবধি আমিই আর না পেরে তোর দাদুকে বললাম, চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। এখানে থাকলে কুট্টি মরে যাবে।

এই অবধি বেশ কয়েকবার শুনে ফেলার পরে যখন আমি কুট্টিপিসির গল্পে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম, ঠিক তখনই একদিন মেমদিদা আবার এমন একটা কথা বলে বসল যে, আমি মাদুর ছেড়ে খাড়া হয়ে বসলাম। মেমদিদা আফিঙের ঝিমুনির মধ্যে খুব ক্যাজুয়ালি বললেন, কুট্টির পেট হয়েছিল।

এটা জানতাম যে, পেট হওয়া মানে প্রেগন্যান্ট হওয়া। রেপড হওয়ার সঙ্গে প্রেগন্যান্ট হওয়ার ব্যাপারটাকে জুড়ে নিতেও সময় লাগেনি। কিন্তু তারপর কী হল? বাচ্চা হয়েছিল নাকি কুট্টিপিসির? নাকি সেই বাচ্চা নষ্ট করে ফেলেছিল, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?

খাড়া হয়ে বসেই আমি মেমদিদাকে বললাম, বলো কি!

হ্যাঁ রে নাতি। ঠিকই বলছি। সে এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়েছিল আমার মেয়েটা। পেটের মধ্যে বেড়ে উঠছে যে-বাচ্চাটা, তার ওপরে একদিকে যেমন কুট্টির ভীষণ ঘেন্না, আবার অন্যদিকে তেমনি মায়া। এবেলা যদি তাকে মারার জন্যে ইচ্ছে করে কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়ে, তো ওবেলাই দেখি তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চুরি করে দুধ খাচ্ছে। ওদিকে

মেয়ের পেট ফুলে ওঠার পর থেকেই তো পাড়াপড়শিরা আড়চোখে তাকায়। ফুসুর-ফাসুর করে। আমাদের পক্ষে বরিশালে থাকা দায় হয়ে উঠল।

তোর পিসেমশাইয়ের তখন পনেরোবছর বয়স, সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ওকে বরিশালের বাড়িতে আমার ছোট জায়ের কাছে রেখে তোর দাদু আর আমি কুট্টিকে নিয়ে চলে এলাম এই বোষ্টমডাঙায়।

কেন? এত জায়গা থাকতে হঠাৎ বোষ্টমডাঙায় কেন?—আমি জিগ্যেস করলাম মেমদিদাকে।

মেমদিদার কথা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। হাত থেকে খসে পড়ছিল হাতপাখা। কোনোরকমে বলল, এইখানে বাস করত একটা আধপাগলা লোক। সে আগে বরিশালে আমাদেরই প্রতিবেশী ছিল। পরে কলকাতার কলেজে চাকরি নিয়ে চলে আসে। পণ্ডিত লোক ছিল কিন্তু স্বভাবে হারামজাদা। কুট্টির ওই দুর্ভাগ্যের বছরখানেক আগে তার বউ মারা গিয়েছিল। লোকটা কুট্টির অবস্থা শুনে নিজেই তাকে বিয়ে করতে চাইল। আমরা তো হাতে চাঁদ পেলাম। ওইজন্যেই এখানে আসা। মাঘমাসের পূর্ণিমাতে কুট্টিকে জানোয়ারগুলো ভোগ করেছিল আর জৈষ্ঠমাসেই প্রফেসর চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নমো নমো করে বিয়ে দিয়ে দিলাম তোর কুট্টিপিসির।

আমার গলা কেমন আঠা আঠা হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে জিগ্যেস করলাম, উনি জানতেন যে...ইয়ে...কুট্টিপিসির পেটে বাচ্চা?

নিশ্চয় জানত। জেনেছিল বলেই তো বিয়ে করেছিল। ওর তো বউয়ের দরকার ছিল না। দরকার ছিল একটা মেয়ের গতর। পরে তো জানলাম, ওর আগের বউটাকেও পরীক্ষে-নিরীক্ষে করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিল লোকটা। আমার কুট্টিকেও মারল।

সেকী! আমার বিস্ময় বাঁধ মানছিল না। বেলগাছিয়া বস্তিতে শিখে-আসা সমস্ত পাকামো দিয়েও আমি নাগাল পাচ্ছিলাম না এক অবোধ্য হিংস্রতার। কোনোরকমে জিগ্যেস করলাম, মেরে লাভ কী হল?

সে কথা আর শুনতে চাস না ভাই। শুনলে বিশ্বাসও হবে না তোর।

শুধু এইটুকু বলে রাখি তোকে—কুট্টিকে যারা পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা বলেছিল ওর শরীরে কোনো যোনি ছিল না। যোনি বুঝিস তো? মেয়েদের যেখানে আদর করলে বাচ্চা হয়...।

আমি ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। একটু একটু বুঝতে পারছিলাম, কেন মেমদিদা জীবনের এতগুলো বছর আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দিল আর কেনই-বা ওর স্বামী শুদ্ধানন্দ মজুমদার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

দুই

একটু বড় হওয়ার পর পিসিমার বাড়িতে যাতায়াত কমতে-কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল আমার। পিসেমশাই মারা গেলেন গত বছরে। পিসিমা তো তার পাঁচবছর আগেই মারা গিয়েছেন। পিসতুতো দাদা কমল ব্যাঙ্গালোরে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার আগে আমার হাতে বোষ্টমডাঙার বাড়ির চাবি দিয়ে বলে গেল, গোপাল, মাঝে মাঝে একটু যাতায়াতের পথে বোষ্টমডাঙায় নেমে যাস। দরজা-জানলা খুলে হাওয়া খাইয়ে আসিস ঘরগুলোকে। নাহলে ড্যাম্প লেগে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

কমলদার কথায় আমি রাজি হয়ে গেলাম। ওই বাড়িটার সঙ্গে আমার অনেক নস্টালজিয়া জড়িয়ে রয়েছে। অনেক আদর, অনেক বই, অনেক পুরোনো গ্রামাফোন ডিস্কের গান।

কমলদা চলে গেল এক সোমবার আর তার পরের রবিবারেই আমি দুপুরের দিকে বোষ্টমডাঙা স্টেশনে নেমে পড়লাম। একসময় পিসেমশাইয়ের হাত ধরে এই প্লাটফর্মে বেড়াতে আসতাম। অনেকক্ষণ বাদে-বাদে একটা করে এমু লোকাল প্রায় জনহীন প্লাটফর্মে দু-দশজন লোক নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। আমি আর পিসেমশাই ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে, লাইনের বাঁকে, হারিয়ে যাচ্ছে সেই ট্রেন। পশ্চিমে, ইটখোলার মাঠের ওদিকে, আকাশে আগুন ধরিয়ে সূর্য অস্ত যেত। প্লাটফর্মের কোল ঘেঁষে

অনেকগুলো শিরীষগাছ ছিল। গ্রীষ্মের বিকেলে সেই শিরীষফুলের হালকা গন্ধ ভেসে আসত, যার সঙ্গে মেমদিদার গলা আর পিঠের পাউডারের গন্ধের কোনো তফাত পেতাম না।

আজ আর সেই প্লাটফর্মের কিছুই নেই। ভিড়ে ভিড়াক্কার প্লাটফর্ম। যেখানে একদিন শিরীষগাছের সারি ছিল, সেখানেই এখন রাশি-রাশি রোল-ঝালমুড়ি-লটারির দোকান। সূর্যাস্ত হারিয়ে গেছে বড় বড় হোর্ডিং-এর আড়ালে। আমি স্টেশন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম মল্লিকপাড়ার সেই বাড়িটায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গেই যেন টাইম মেশিনের কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরে গেল।

সেই হিম ঠান্ডা ঘর, সেই আবছায়া দুপুর। বন্ধ ঘরের গুমোট বাতাসে কবেকার এক বালবিধবার প্রসাধনীর গন্ধ। মেমদিদার ঘরের দেয়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আঠেরোবছরের এক মেয়ের জোড়াবিনুনি বাঁধা সাদাকালো ছবি। তার চোখের পাতা সুখস্বপ্নে ভারী, যেরকম সুখস্বপ্ন শুধু আঠেরো বছরের মেয়েরাই দেখতে পারে। তার বাঁ-গালে আঁচিল আর ছবির ফ্রেম থেকে ঝুলছে সাপের শিরদাঁড়ার মতন শুকনো রজনীগন্ধার একটা মালা।

অনেকদিন আগে এই ঘরের মেঝেতে শুয়েই আমি মেমদিদার মুখে শুনেছিলাম এক আশ্চর্য প্রলাপ। মেমদিদা বলেছিল, যেদিন ওরা মাত্র ছয়জন মিলে কুট্টিপিসিকে দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যায়, সেই রাতটা ছিল জন্মাষ্টমীর রাত। সে কী বৃষ্টি, সে কী বৃষ্টি।

'ওরা' মানে শ্মশানবন্ধুরা। খবর পেয়ে আগে থাকতেই শ্মশানে মজুত ছিলেন পুরোহিত তুলসী ভট্টাচার্য।

যেহেতু কুট্টিপিসি ছিল গর্ভিনী, কাজেই তুলসী ভট্টাচার্য বিধান দিলেন আগে গর্ভসংস্কার করে তারপর কুট্টিপিসির শবদেহ চিতায় তোলা হবে। সেইমতন শ্মশানবন্ধুরা কুট্টিপিসির শরীর থেকে কাপড় সরাতেই তাদের মাথায় বাজ পড়ল। তারা দেখল, যেখানে একজন নারীর যোনি থাকার কথা, সেখানে রয়েছে কেবল শীতল কঠিন মার্বেল-ফলকের মতন এক তিনকোনা পেশী।

সেখানেই শেষ নয়। যোনিহীন কুট্টিপিসিকে দেখে শ্মশানবন্ধুর দল যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক তখনই নাকি কুট্টিপিসির শরীরের এখান-ওখান থেকে চামড়া ফাটিয়ে বেরোতে শুরু করল একটা দুটো তিনটে চারটে গুটি। কমা-চিহ্নের মতন ঘিয়ে রঙের গুটিগুলোকে দেখে ওদের ছ'জনেরই কিছু একটা জিনিসের কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু সেটা যে কী, তা ওরা পরেও কখনো বলতে পারেনি। যাইহোক, গুটিগুলো নাকি তারপর নিজেরাই শুঁয়োপোকার মতন বুকে হেঁটে শ্মশানের লাগোয়া খালের নরম মাটির মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য দেখে উন্মাদের মতন দৌড়ে পালিয়ে আসে ছজন শ্মশানবন্ধু। তুলসী পুরোহিত সেখানেই বুক চেপে ধরে শুয়ে পড়েন এবং তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি বন্ধ হয়ে যায়।

আমি ভাবছিলাম, আফিং-এর নেশা কতটা প্রবল হলে একজন মা তার নিজের মৃতা মেয়েকে নিয়ে এমন বীভৎস হ্যালুসিনেসন দেখতে পারে। কৈশোরের উগ্রতায় সেদিন আমি চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম—চুপ করো, চুপ করো মেমদিদা। কীসব আলতু-ফালতু বকছ? এরকম হতে পারে নাকি?

মেমদিদা শান্ত গলায় বলেছিল—আমিও তো তাই ভাবতাম রে গোপাল। হতে পারে না। কিন্তু সেই যে হারামজাদা চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সেই যে আধপাগলা বুড়ো, আমার জামাই, সেই আমাকে একদিন তার ল্যাবরেটরির কোণে রাখা পাথরকুচির গাছ দেখিয়ে বলেছিল, দেখুন মা, দেখুন—কেমন পাতার কিনারা থেকে কচি-কচি শেকড় নামছে। ছোট ছোট মুকুল বাইরে মাথা বাড়াচ্ছে। পাথরকুচির ফল নেই, ফুল নেই। তবু জন্ম নিচ্ছে ঠিক মা-গাছটার মতনই কত চারাগাছ। চন্দ্রনাথ বলেছিল, একশো...ঠিক একশোবছর লাগবে মানুষের গুটি বড় হতে।

আমি তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা-জানলাগুলো হাট করে খুলে দিলাম। বাইরের আলো-হাওয়া ঘরে ঢুকতেই মনটা আবার বর্তমানকালে ফিরে এল। মনে হল, এই ভালো। ভালো এই ভিড়, রাস্তায় আলোর ত্রিশূল, অটোরিকশাওলাদের খিস্তি। এইসবের মধ্যে অন্তত মেমদিদার সেই বিকারগ্রস্ত কল্পনাগুলো লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আলো এলে পাপ দূরে চলে যায়।

তিন

যখন মালিকপাড়ার বাড়িতে তালা লাগিয়ে বেরোলাম, তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে ন'টা। কলকাতা থেকে মাত্র পঁচিশমিনিটের দূরত্বে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা শহরের কাছে এটা এমন কোনো রাতই নয়—তা হোক না সেটা জন্মাষ্টমীর বাদুলে রাত। তবু রাস্তায় এত কম লোকজন থাকার তো কথা নয়। মনে হচ্ছিল কারফিউ জারি হয়েছে কোথাও।

যারা আছে তাদের মধ্যে একদলের চেহারা ভয়-জাগানো আর এক দলের ভয়-পাওয়া হাবভাব। প্রথম দলটাই সংখ্যায় ভারী।

রোগা খেঁকুরে পুরুষমানুষের ছোট ছোট দল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দৈবাৎ কোনো মেয়ে—তা সে যে বয়সেরই মেয়ে হোক—চোখে পড়ে গেলে তারা হামলে পড়ছিল সেই মেয়ের গায়ে। নির্দ্বিধায় বুকে হাত দিচ্ছিল। সঙ্গে সিটি, খিস্তি, বিছানায় যাবার ডাক। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে দেখা বুনো কুকুরের দলের ছবি। হরিণীদের কথাও মনে পড়ছিল, বুনো কুকুরেরা যাদের জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়।

শুধু এক্ষেত্রে ওদের খিদেটা পেটের খিদে নয়, তলপেটের। এত যৌন-উপবাসী মানুষ একসঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

ভয়-পাওয়া মানুষদের মধ্যে একজন আমার পাশেপাশেই হাঁটছিলেন। মাঝবয়সি মানুষটির চেহারা নিরীহ, কেরানি ধরনের। দেখেই বুঝতে পারছিলাম, উনি জোরে পা চালাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পেরে উঠছেন না। সেটা বোধহয় কোনো শারীরীক অসুস্থতার কারণেই হবে। সমস্ত তাড়া ফুটে উঠছিল ওনার ভয়-পাওয়া চোখের তারায়। আপনমনেই তিনি বলে উঠলেন, আজ যে কী হবে ভগবানই জানেন।

আমি বললাম, কিসের কী হবে?

অন্যদিন একটা না একটা রিকশা পেয়ে যাই। আজ স্ট্যান্ড খালি। রিকশা পেলাম না। মামনকে নিয়ে ফিরব কেমন করে?

প্রশ্ন করলাম, মামন কে? আপনার মেয়ে?

হুঁ। টিউশনে পড়তে গেছে। এতবার বলি, সন্ধেবেলার টিউশনটা ছাড়। ছাড়! তা শোনেই না। সপ্তাহে এই দুটোদিন আমার যে কী টেনশনে কাটে তা কী বলব।

কেন বলুন তো? কিসের ভয়?

ভদ্রলোক চলা থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, বাইরের লোক?

আমি ঘাড় নেড়ে বোঝালাম, হ্যাঁ।

রাত ন'টার পর বোষ্টমডাঙার রাস্তাগুলো হয়ে ওঠে কিলিং-ফিল্ড। বধ্যভূমি। বুঝলেন? মেয়েদের বধ্যভূমি। প্রতিদিন দুটো-তিনটে করে রেপ হয় এখানে। আমার মেয়ের বয়স পনেরো। এবার বুঝলেন, কিসের টেনশন?

ভদ্রলোক তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কোনদিকে যাবেন?

আমি?...থতমত খেলাম।

কেমন করে বলি, যাবার কথা ছিল স্টেশনে। কিন্তু এইমাত্র আমার মাথায় একটা অদ্ভুত ঝোঁক চেপেছে। আমি কয়েকমুহূর্ত আগেই ঠিক করেছি, স্টেশন নয়। আমি শ্মশানের দিকে যাব। সেসব কথা না বলে ওনাকে বললাম, কোথাও যাব না। রাস্তায় হাঁটব। ওই দেখুন, একটা রিকশা আসছে। আপনি উঠে পড়ুন।

ভদ্রলোককে নিয়ে রিকশাটা চলে যাওয়ার পরে আমি অলিগলির মধ্যে দিয়ে পা চালালাম বিশাইচণ্ডী শ্মশানের দিকে। একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। দশটা। একটা কানাগলির মধ্যে থেকে মেয়েলি গলার আর্তনাদ আর তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা পুরুষকণ্ঠের উল্লাস ভেসে এল। চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম, দুটো রোগা নির্লোম ফরসা পা দাপাতে-দাপাতে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কুকুরে শিকার টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু আগে শোনা আরেকটা পুরুষকণ্ঠ হাহাকার করে উঠল—মামন মামন! ওগো, কে কোথায় আছ, আমার মেয়েকে বাঁচাও।

অন্যদিন হলে কী করতাম বলতে পারছি না। কিন্তু আজ আমি চলা থামালাম না। আজ কুট্টিপিসির মৃত্যুর একশোবছর পূর্ণ হচ্ছে। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন না, মানুষের বীজ ফুটতে একশোবছর লাগে? আজ আমার মনে হচ্ছে যদি এই ধর্ষণের রাজত্ব সত্যি হয় তাহলে মেমদিদার কথাও সত্যি। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা সত্যি। কুট্টিপিসির শরীরে যে যোনি ছিল না সত্যি সেই কথাও।

ওই তো, ওই তো শ্মশান। আমি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পোড়াকাঠ আর ভাঙা কলসির টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে দৌড়ে চললাম শ্মশানের লাগোয়া খালটার দিকে। ওই খালের পাড়ে নরম জমিতেই নাকি ডুবে গিয়েছিল কমা-চিহ্নের মতন রক্তমাংসের গুটিগুলো। একশোবছর...ঠিক একশোবছর আগে।

শ্মশানে আর কোনো মৃতদেহ ছিল না। ডোমের ঘরের উঠোনে একটা মাত্র কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছিল। তার ঘোলাটে আলোয় দেখলাম একটা দুটো-তিনটে মেয়ে—তিনটে উলঙ্গ মেয়ে, পূর্ণ যুবতী, তাদের চিকন স্তনে বাল্‌বের হলুদ আলো পিছলিয়ে যাচ্ছিল, সরু কোমর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল বৃষ্টির জলের ফোঁটা—আমার পাশ কাটিয়ে মেয়েগুলো শহরের দিকে রওনা দিল।

আরও তিনটে মেয়ে ততক্ষণে কাদার ভেতর থেকে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে উঠে আসছিল। আগের তিনটে মেয়ে শ্মশানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। বুঝতে পারলাম, ওরা অপেক্ষা করছে বাকি তিন বোনের জন্যে। আমি দেখলাম, ওদের ছজনেরই মুখগুলো হুবহু এক—যেমন একরকম দেখতে প্রত্যেকটা পাথরকুঁচির গাছ। ওদের ছ'জনেরই চোখের পাতা স্বপ্নে ভারী আর ছ'জনেরই বাঁ-গালে আঁচিল।

ওদের ছ'জনকেই ওদের মায়ের মতন দেখতে। কুট্টিপিসির মতন দেখতে। সন্দেহ নেই ওরাই কুট্টিপিসির শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সেই কমার মতন ভ্রূণ, একশোবছর ধরে মাটির রস খেয়ে যারা নারী হয়েছে।

হঠাৎ শ্মশানের গেটের কাছ থেকে উল্লাসধ্বনি ভেসে এল। 'মার দিয়া

শালা কেল্লা। এ শালা কি জিনিস পাঠিয়েছে রে ভগবান। আব্বে রশিদ, ভোকু, ছিনে—কোথায় গেলি বে? লুটে লে ইয়ার, লুটে লে'।

আরো দশমিনিট বাদে একপাল হতবাক ধর্ষকের মধ্যে দিয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে শহরের দিকে চলে গেল ছ'জন উলঙ্গ যুবতী। দেখলাম তাদের উরুসন্ধিতে মার্বেল পাথরের মতন কঠিন নিভাঁজ ত্রিভুজ। বুঝলাম, ওরা আপাতত এই শহরের ধর্ষণযোগ্যা নারীদের মধ্যে মিশে যাবে। তারপর একদিন সঙ্গম ছাড়াই ওদেরও শরীর ভেদ করে ভ্রূণ জন্ম নেবে—রাশি রাশি কণ্যাভ্রূণ। একশো-পাঁচশো হাজার বছর পরে সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে যোনিহীন নারীতে।

তখন আর ধর্ষণ থাকবে না।

পুরুষও না।
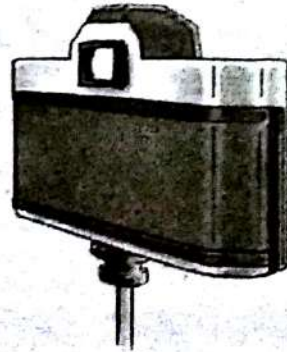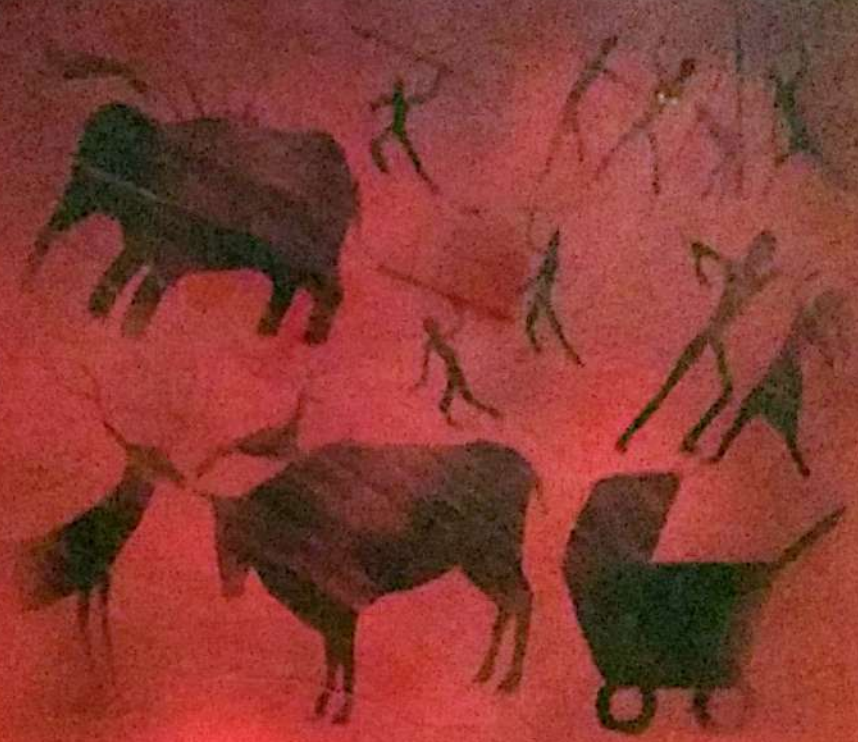
১২টি গল্প। না, শুধু গল্প বললে কিছুই বলা হয় না। ভয়ংকর, নৃশংস, গায়ে কাঁটা দেওয়া এক-একটা উপাখ্যান। এক কথায় অন্ধকার বা অন্য দুনিয়ার গল্প। বাংলা কল্প-গল্প জগতে এমন অসহ্য আতঙ্কের গল্প খুব কম লেখা হয়েছে।